



# নেপালের পথে

শ্রীশুধীরকুমার আচার্য্য

( এডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট )

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা বি, এ

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

প্রকাশক—  
শ্রীবিজনকুমার আচার্য  
৮নং নীলানন্দ মুখার্জি ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা ।

প্রথম সংস্করণ  
ভাদ্র ১৩৪৩

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ,  
আইডিয়াল প্রেস  
১২১, হেন্সলি সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

এই গানের ভূমিকা লিখিতে অন্তরুদ্ধ হইয়াছি। বাংলা ভাষায় লমণ রুত্তান্তের বড়ই অভাব, এই অবস্থায় লমণ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের কার্যে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। গ্রন্থকার শিবরাত্রির সময় পশুপতিনাথেব মেলা দর্শন করিতে নেপালে গিয়াছিলেন। পথের বর্ণনাটা সরল ও মনোজ্ঞ। পশুপতিনাথে যাত্রার যাইতে চাহেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িলে পথের স্তবিধা অস্তবিধার কথা অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।

ভাদ্র পূর্ণিমা।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৪৩



নেপালের পথে

রমেশের ডায়েরী



## নেপালের পথে

অনেক দিন আগেব কথা। মাসটা বোধ হয় জানুয়ারী। শীতের মাঝেই ফাস্কনের হাওয়া দেখা দিয়েছে। Bachelors' league এর open air meeting প্রায় একেবারে বন্ধ। একে হাওয়াটা লীগ বেসপেক্স খুবই খারাপ, তার উপর সভ্যবৃন্দের অভিভাবকগণ 'লীগ' ভাঙ্গবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। নতুন কিছুব অভাবে প্রাণটাও উঠছে হাঁপিয়ে। এমন সময়ে সুধীরদা একদিন চুপি চুপি এসে বলেন—'যাবেন, নেপালে?' লায়িষে উঠে বল্লাম, 'কবে?' 'সুধীর দা' বলেন, শিববার্ত্রব সময়ে। দমে গেলুম, বল্লুম, 'অত দেবীতে, আগে যাওয়া যায় না?' দাদাটী গম্ভীর ভাবে বলেন, তাব আগে 'pass port' পাওয়া যায় না। নিরুপাষ হয়ে বল্লুম, তথাস্ত। মনকে আশ্বাস দিলাম, কাবণ গুনেছি নাকি সবুবেই যেওয়া পাওয়া যায়।



## নেপালের পথে

শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী

• .....দিন গুন্তে গুন্তে সাতদিনে ঠেকলো। অথচ বাবার কোনও কিছু ঠিক করতে পারলুম না আজও। বন্ধু নিতাই তাগাদা দেন, কি হ'লো? আসছে রবিবারের মধ্যে যা হোক কিছু একটা ঠিক করবো বলে বন্ধুকে আশ্বাস দিলুম।

রবিবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী

ছপুৰে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। চৌকাট্‌পেরিয়ে ঢুকতে নজর পড়লো কাল বোর্ডে জন্ম জন্মে সাদা 'আউট' লেখাটার উপর। ভাবলুম দিবা নিদ্রার ব্যাঘাতের জন্ত দাদার আমার বোধ হয় এ একটা 'বড়ের' চাল। কলিং বেলটা টিপতে উৎকলবাসী ভৃত্যটি খবর দিল, 'দাদাবাবু ন' অছি'। বললুম 'ন অছি ত ন অছি' একটু কাগজ আন দেখি। আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলে, 'কঁর কউছি'। ভাবলুম আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল হাত নেড়ে অনেক কষ্টে ত' তাকে বোঝান গেল। মিনিট দশেক পরে কোথা থেকে একটা রাস্তার হাণ্ডবিল্‌ নিয়ে এসে হাজির। ভাবলুম, তবু ভাল, যে একটা শালপাতা

## নেপালের পথে

এনে দেয়নি ! পকেট থেকে ‘ফাউন্টেন-পেন’টা বার করে লিখতে গিয়ে দেখি সময় বুঝে কালিও গেছে ফুরিয়ে। ভাবলুম, একে যদি এখন কালি আনতে বলি, তাহলে হয় তো মন্দিরে ছুটবে ! কাজেই অন্য কোন উপায় করতে পারি কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলুম। ছেলে বেলায় গড়া ‘Necessity is the Mother of Invention’ বাস, সামনে দেখি সুধীরদা’র ঘর ধোয়! একটু জল দরজার কাছে জমে। ‘সেলফ্ ফিলার’ দিয়ে একটু খানি সেই জল কলমে ভর্তি ক’রে নিয়ে লিখলুম, Get ready, রাতে আসছি।’ রাতে এসে দু’জনে অনেক ভেবে চিন্তে আগামী কাল (অর্থাৎ সোমবার) রাত্রি সাড়ে নটায়, ১১ আপ দানাপুর এক্সপ্রেসে মোকামা ঘাট হয়ে রক্সোলে যাওয়া ঠিক করলুম।

সোমবার ১৭ই কেক্রয়ারী

বিকালে ‘রেলওয়ে সিটি বুকিং অপিসে’ গেলুম দু খানা টিকিট ক’রতে। কাটা ঘুল্ ঘুলি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম; আচ্ছা রক্সোলের রিটার্ন টিকিট পাওয়া যায়? উত্তর এলো—“Certainly you can get inter-class eigh-

## নেপালের পথে

teen-days-return ticket which will cost you eigheteen rupees."

বান্গালী দেখে বাংলাতে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। যা হোক উত্তর এলো ইংরাজীতে, ভাড়া সমেত। বল্লুম, Thanks, can you tell me how many miles it is from Calcutta ?

—Oh yes, about four hundred and fifty eight, just in the borderline of the British government—Thanks; Two tickets please.

টিকিট ছ'খানা হাতে নিয়ে বান্গালী সাহেবকে ডবল 'থ্যাঙ্কস্' দিতে দিতে বাড়ী ফিরে এলুম। \* \* \* \* কল্কাতার বুকে সবে তখন সন্ধ্যা নামছে। দূরে আকাশে সোনালী রঙ ধরেছে। ছোট্ট এক টুকরো কাল মেঘের ধারে ধারে সোনালী আলোর 'বর্ডার'টাকে দেখাচ্ছিল ঠিক বড় লোকের বাড়ীর দামী বিলাতী অস্পষ্ট ছবির উপরের গোন্ড গিলেটের ফ্রেমের মতন।

ছোট স্টকেস হাতে চলতে চলতে এমন অনেক কথাই ভাবছিলাম। স্বধীরদার বাড়ী পৌছে দেখি,—

## নেপালের পথে

আসন পাতা মায় জলের গ্রাস পর্য্যন্ত হাজির। বিনা  
বাক্যে বসে পড়লুম।

থেয়ে দেখে মটরে চড়লুম। আমি সুধীরদা' আর  
তাঁর ভাইপো বিজন, আমাদের বার্তাবহ ভগ্নদূত।

রাস্তার মাঝে হঠাৎ মটর গেল থেমে। বন্ধুকে বললুম,  
'Morning shows the day'। উত্তর পেলুম, এই করেই  
জাতটা গেল।

প্রায় মিনিট দশেক পরে আমাদের বাহন গা কাড়া  
দিয়ে উঠল। 'জয় বাবা পশুপতিনাথ বলে আমরা  
নড়ে চড়ে বসলুম।

ষ্টেশনে এসে দেখি ট্রেন সবে 'ইন্' করেছে। কম্পার্ট-  
মেন্ট গুলি খোর অন্ধকার। রেল কোম্পানীর মিতব্যয়িতা  
দেখে খুসী হলুম এই ভেবে যে আলো একটু কম পুড়লে  
রেলভাড়াও হয়তো বা একটু কমতে পারে। আর ভাড়া  
কমলে আমাদের মত বহিমিহ্মানদের দেশ বিদেশ ঘুরে  
বেড়ানরও একটু আর্থটু সুবিধে হয়।

একটা ছোট দেখে কামরায় উঠা গেল। সাম্না সাম্নি  
দু'টো বেঞ্চে আমাদের কয়ল দু' খানা পেতে ফেললুম।

## নেপালের পথে

স্ট্রটকেশ হু'টো। তার খানিকটা ক'রে গায়ে জড়িয়ে বালিসের আকার ধারণ করল।

বজ্রবরকে প্রচুরী রেখে প্লাটফর্মের নেমে পড়লুম খুঁজে দেখতে আমাদের মতন হু' একটা 'ছন্নছাড়া' আর কেউ আছে কি না। ঘুরতে ঘুরতে এন্জিন ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলুম। একটুখানি ফিকে চাঁদের আলো পথ ভুলে টিনশেড ডিঙ্গিয়ে প্লাটফর্মের প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে কল্পনার তুলি দিয়ে মানস পটে নেপালের একটা রূপ আঁকছিলাম। হঠাৎ, ফিল্মে দেখা মহাযুদ্ধের রণ হুকারের মত ভীষণ কোলাহলের শব্দে চমকে উঠলাম।

দ্রুত পদে বজ্রবরের অবস্থা দেখবার জন্য কামরাব দিকে এগিয়ে চল্লুম। ফিরে গিয়ে দেখি অন্ধকারে একটা কোণে দাদাটী চুপ চাপ বসে আছেন আর তাঁর সামনে স্তপাকার জিনিষ পত্র...যেন গৌরী শঙ্করের ছোটখাটো এক পকেট এডিসন্।

বল্লুম, দাদা বসে বসে কি আলাদীনের প্রদীপ ঘস্ছিলে নাকি? হাসতে হাসতে বজ্রবর বলেন, এক ভজলোকের

## নেপালের পথে

বাড়ীতে বিয়ে, তাই কল্কাতা থেকে বাজার করে নিয়ে যাচ্ছেন। বল্লুম, যাক্ তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণটা খেয়ে নেওয়া যাবে। বন্ধুবরের চোখের ইসারায় পিছন ফিরে দেখি ভদ্রলোক তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছেন। অমাগ্নিক হাসি হেসে তিনি বলেন সে ত' আমার সোভাগ্য। তারপর আমাদের দু'জনকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে আমাদের গন্তব্য পথের দোহাই দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা গেল। বোঝান পর্ব শেষ করে দেখি ক্ষুদ্র কামরাটি 'ওভারপ্যাণ্ট'। বারজন বসবার স্থলেকত 'বার' যে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। আমরা ঠিক হ'য়ে বসলুম। মিনিট পাঁচেক পরে ট্রেনটি আমাদের মতন বাংলামাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যাত্রা শুরু করলো।

রেখে যাওয়ার আর উপরি পাওয়ার, ব্যথা আনন্দে মনটা তখন মসৃণল। খাঁচা ছেড়ে পাখীটা যখন মুক্ত আকাশের দিকে উড়ে যায়, পিছন ফিরে শূন্য পিঞ্জরের দিকে তাকায় কি না সেই কথাটা তখন ভাবছি !

## নেপালের পথে

কথায় বলে চিতা আর চিন্তা ! ভাবতে ভাবতে হিমালয়ের বৃকের উপর ছোট দেশটার কথা মনে এলো । ভেসে উঠলো একখানা ছবি, স্রষ্টার মতন অটুট গান্ধীর্ষের সঙ্গে জগৎ সভায় যে তার স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে আসছে, যারই উদ্দেশ্যে আমরা চলেছি ।

বৈটে খাটো লোক গুলির কথা, যারা হিন্দু বলে আমাদের মতন পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় না । হোক না পথ যতই বন্ধুর, হু পাশে থাকুন কেন বিপদের ডাক, আমরা চলেছি এবং যাবও তার বৃকে.....ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেণটা থেমে গেল । গোলমালে জেগে দেখি, সীতাভোগ মিহিদানার দেশে এসেছি ।

\* \* \* \* \*

ইধার আইয়ে, বাবুজি ? বিলকুল খালি ।

কথা গুলির ভিতর কী যাহুছিল জানি না, এক নিমেষে সমস্ত গাড়ী গুরু লোক সমন্বরে জানিয়ে দিল,—স্থানাভাব । জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাঁপাচ্ছেন আর বলছেন—একটা ইষ্টিসান, মশাই, দয়া

## নেপালের পথে

করুন। দরজাটা খুলে বল্লাম, আসুন, একজনের যাগগা, হয়ে যাবে। গাড়ী শুদ্ধ লোক চিৎকার কবে উঠলো—ভাবি যে দাতাকর্ণ হলেন দেখতে পাচ্ছি।

তর্ক করা বৃথা। আবাহমান কাল থেকে চলে আসছে এই ধরনের ব্যবহার। যে যাগগা পায়, সে তখন চায়, যেন আর কেউ না উঠে, গাড়ী তাকে একলাই নিয়ে চলুক।

যাহোক ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বেঞ্চের এক ধারে বসে পড়লেন। কুলি মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে এক ‘বিরানী সিক্কায়া’ সেলাম দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল যে বাবুজী এমন সুন্দর ভাবে উঠতে পেরেছেন দেখে সে খুবই খুসী হয়েছে। এবং এইবার বাবুজীব তাকে খুসি করা একান্ত কর্তব্য। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সিকি বাব করে তার হাতে দিয়ে মুখেব দিকে উৎসুখ হয়ে চাইলেন, বোধ হয় তাব খৈনি খাওয়া দাঁতের একটু হাসি দেখবার মানসে। কিন্তু তাঁর সকল আশা বিফল করে ‘কুলি সাহেব’ জানিয়ে দিল যে ষোল আনার কমে তিনি খুসী হবেন না। ভদ্রলোকটা বেশ ব্যাকুল ভাবে বল্লেন, ‘নিয়ে নাও ভাই, নিয়ে নাও। আমি তোমায



## নেপালের পথে

অনেক বেশী দিয়েছি’। বাবুজীর সাম্যবাদ কুলিকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। সে বেশ জোর গলায় জানিয়ে দিল যে ট্রেন এক্সুনি ছাড়বে। এবং তাকে সত্বর ‘খুসী’ করা প্রয়োজন। ভদ্রলোককে পুনরায় সাম্যভাবের পরিচয় দিতে উত্তত দেখে এক ভদ্রলোক তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে বলেন। ভদ্রলোক তখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলেন, “মশাই, আমার ত্রিবেণীর জল যে কুলির কাছে রয়েছে।” অনেক জিজ্ঞাসার পর জানা গেল যে ভদ্রলোক ত্রিবেণীতে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্ত গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ভবিষ্যৎ পুণ্যের জন্ত একটি মাটির পাত্রে ত্রিবেণীর জল নিয়ে দেশে ফিরছেন। কুলি সব জিনিষ পত্র গাড়ীতে তুলে দিয়েছে, কেবল তার বক্সিসের Securityর জন্ত মাটির পাত্রটি আটকে রেখেছে।

মনে মনে কুলির বুদ্ধির প্রশংসা করছি, এমন সময় দেখি ভদ্রলোক আবার তাকে অহরোধ কচ্ছেন, “দিয়ে দাও, ভাই দিয়ে দাও গাড়ী এক্সুনি ছাড়বে।”

একজন এতক্ষণ গাড়ীর এক কোনে চুপচাপ শুয়ে-ছিলেন। ভদ্রলোককে অমন করে কাকুতি মিনতি করতে

## নেপালের পথে

দেখে হঠাৎ উঠে বসে বলেন—“শুধু ভাই, ভাই বলে চলবে না, গলা জড়িয়ে ধরুন—গলা জড়িয়ে ধরুন।” গাড়ী শুদ্ধ লোক তাঁর কথায় বেশ এক চোট হেসে নিল। তার পর সেই ভদ্রলোক গাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে কুলিকে এক ধমক দিতে কুলি মহাপ্রভু লক্ষ্মী ছেলের মত মাটির ভাঁড়টী রেখে চম্পট দিল।

আবার একটানা ছন্দ, “যাচ্ছি যাব ব্যস্ত কেন” সুরে গাড়ী চলতে শুরু করলো। বসে বসে, ঢুলতে ঢুলতে কেউ সহ যাত্রীর কাঁধে মাথা রেখে বেশ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কারো বা পা, অশ্রু এক জনের মাথার উপর চলে গেছে। ঘুমের নেশা পূর্বেকার সব বিধা, বন্দ ঘুচিয়ে দিয়েছে। সবাই চায় কোন রকমে একটু ঘুমিয়ে নিতে, ক্লান্ত শরীরকে একটু আরাম দিতে। হয় তো রাত্রির প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আবার আসবে কোলাহল, আসবে তুচ্ছ কারনে, অকারণে বিবাদ বিসম্বাদ। কিন্তু এখন? যুদ্ধাবসান্তে সৈনিকের মতন যে যেমন করে পারে, মাথা হাঁটু এক করে একটু আরাম করে নিচ্ছে।

দেখতে দেখতে রাণীগঞ্জ, আসানসোল পেরিয়ে গেল।

## নেপালের পথে

অদূরে কয়লা-কুটির কয়লা গোড়াবার আলো হঠাৎ মনে আগুন লাগার ভীত এনে দেয়।

ক্রমে সাঁওতাল পরগনার রাঙামাটীর সরু সরু পায়ে চলা পথ অস্পষ্ট চাঁদের আলোর দেখা দেয়। মল্লয়ার পাগল করা গন্ধে মাথার মধ্যে চিন্তা স্তরের জট পাকিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা “গুম্, গুম্” শব্দে নীচে তাকিয়ে দেখি অজয় নদীর পোল। এর পরেই মশিড়ির স্টেশন। সেখান থেকে গাড়ী বদল করে বৈজ্ঞান্য-ধামে যেতে হয়। বৈজ্ঞান্যের কথা মনে আসতেই তার পৌরাণিক কাহিনী মনে এলো—সেই কবে রাবণ নাকি শিবলিঙ্গ মাথায় করে এনেছিল—সেই সব কথা।

তারপর কখন এই সব এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ীর জানলায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, বজুর ডাকে ধরমড়িয়ে উঠে বসলাম। বজু জানিয়ে দিল গাড়ী কিউল পার হয়ে চলেছে। সামনে মোকাম ঘাট। সেখানে আমাদের নেমে বি এন্ ডব্লু আর এর—ষ্টীমারে উঠতে হবে।

## নেপালের পথে

মঙ্গলবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী

দিনের আলো বেশ ফুটে উঠেছে। সামনেই গঙ্গার জলের উপর সাঁতার দিতে দিতে থেমে, ভাসতে থাকা রাজ হাসের মত শীমার খানা দাড়িয়ে আছে। যাত্রীদের গাড়ী থেকে নামতে দেখে সারেঙ সাহেব ভেঁা দিয়ে তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে দিলেন। হুঁধারে বালির চড়ার মাঝ দিয়ে সম্প্রতি একটা সরু পথ শীমার পর্যাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্ট্রাকেশ ও কন্সল নিয়ে আমরা শীমারে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে শীমার ছেড়ে দিল।

দাদাটী উপরে কেলনারের ঠেলে গেলেন চা খেতে। দাড়িয়ে দাড়িয়ে রেলিংএ ভর দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ দেখছি। খানিক পরে সুবীর দা' ফিরে এসে বলেন—“কি ভাবছ?” বলুম, বলা মুশিল। কারণ কি যে তখন ভাবছিলাম তা নিজেই জানি না। কখনও হয়তো ভাবছি “কোথা হতে আসিয়াছ নদী? নদী কহিল মহাদেবের জটা হতে।” আবার কখনও “Men may come and Men may go But I go on for ever” প্রভৃতি আবোল তাবোল। মিনিট কুড়ির মধ্যে শীমার আমাদের সমিরিয়া ঘাটে পৌঁছে

## নেপালের পথে

দিল। সামনে বি, এন্, ডব্লু, আর, এর দেশলায়ের বাক্সর মতন গাড়ী গুলি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ষ্টীমার ছেড়ে, তাতে চেপে বসলাম। গঙ্গার চড়ার উপর দিয়ে রেল চলেছে। চারিদিকে বালি আর বালি, যেন মরু সমুদ্র। কোন খানে একটু সমতল বালিমাটির মধ্যে ছোট্ট একটা বুনো গাছের কোপ, জু'চারটে ঘাস মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আবার তারি পাশে উচু নীচু ঢেউএর মতন সারি সারি সোনালী বালির ঢিপি চলে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে পায় চলা পথ গঙ্গার বুক পর্য্যন্ত নেমে গেছে। হয়তো কাছের গ্রাম থেকে মেয়েরা জল নিয়ে যায়।

প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা বারুণী জংসনে ( Baruni Jn ) পৌঁছলাম। বারুণী বি, এন্, ডব্লু, আর, এর বেশ বড় ষ্টেশান। আমিন গাঁও—এলাহাবাদ সিটি through passenger পার্কসীপুর, দিনাজপুর, কাটীহার প্রভৃতি বাংলা দেশের ভিতর দিয়ে এসে বিহারের সীমানায় পড়ে। সেখান থেকে বিহারের ভিতর দিয়ে এই বারুণী জংসনে আসে। তারপর Teghra ( তেঘরা ) Bachhwarar ( বাচোয়ারা ) উপর দিয়ে শোনপুর (Sonepur)

# নপালের পথে



বাংলা ও বিহাৰ



## নেপালের পথে

হয়ে বরাবর এলাহাবাদে চলে যায়। সেই জন্তু অনেকেই আমিনগাঁও এলাহাবাদ সিটি (Amingaon Allahabad City passenger) প্যাসেন্জার এ বাকুণী হয়ে নেপালে যায়।

ষ্টেশানে দেখলুম Refreshment room রয়েছে। দুধ ও খাবার বেশ সস্তা। বাকুণীকে বিদায় দিয়ে বেলা দশটা আশ্রাজ সমস্তিপুরে পৌঁছলুম।

এখান থেকে রক্সোল যাবার ছোটো পথ। প্রথম সমস্তিপুর থেকে মজাফরপুর, মতিহারি দিয়ে সিগোলী এবং সেখান থেকে ট্রেন বদল করে রক্সোল। দ্বিতীয়টী দ্বারভাঙ্গা, জনকপুর, সীতামারীর মধ্যে দিয়ে বৈরাগনিয়া এবং সেখান থেকে অল্প ট্রেনে রক্সোল। দ্বারভাঙ্গার আগের ষ্টেশন লাহেরিয়াসরাই। সেখানে বন্ধুটির ভগ্নীপতি থাকেন। কিছুকালের জন্তু তাঁদের বাড়ীতে ইন্ট্ করে যাব বলে দ্বারভাঙ্গার ট্রেনে চড়ে বসলুম।

সমস্তিপুর ছাড়াতে দুপাশে ভূমিকম্পের চিহ্ন দেখা যেতে লাগলো। লাইনের দুধারে প্রকৃতির উন্মত্ত খেয়ালের ইতিহাস—ইটকাটের স্তূপ জানিয়ে দিল কত গৃহহীনের



## নেপালের পথে

কথা। বেলা প্রায় বারটার সময় আমরা লাহোরিঙ্গা সরাইতে পৌঁছলাম।

থেরেদেয়ে বেশ এক ঘুম দিয়ে উঠে দেখি বেলা পাঁচটা। ট্রেন সেই রাত ৮টায়। স্মুতরাং সফরটাকে বেশ একটু ঘুবে ফিরে দেখে নিতে বেরুলুম। ফিরে এসে দেখি, স্মুধীবদাব ভগ্নীপতি স্মুশীলবাবু লোটাকঞ্চল বাঁধছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে বলেন—তার অনেক দিন ধরে সংসাবে বৈরাগ্য এসেছে এবং সেই বৈরাগ্যের antidote হিসাবে তিনি সাত দিনের জ্ঞান সন্ধ্যাসী হতে প্রস্তুত। সানন্দে তাঁকে দলে ভিড়িয়ে নিলুম। দুয়ে একে তিন হয়ে যাত্রা আরম্ভ করা গেল। অবশ্য admission fee হিসাবে লুচি, সন্দেশ ভর্তি একটা হাঁড়ি নিয়ে। দাদাটী তাঁর গামছা দিয়ে হাঁড়িটাকে বেশ ভাল করে বেঁধে নিলেন।

রাত ৮টার ট্রেনে উঠে পড়া গেল। গাড়ী একেবারে খালি প্রায় ৬৭ মাইল অর্থাৎ বৈইরাগনিয়ার আগে, আর গাড়ী বদল করতে হবে না বলে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। দুধারে খোলা মাঠ। তার উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে। কন্ কন্ ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দাঁতে দাঁতে ঠক্ঠকি লাগিয়ে দিচ্ছে।

## নেপালের পথে

দুমবার দুখা চেষ্ঠা ত্যাগ করে উঠে বসলাম। লাইনের দারে ধারে ঝাঁকড়া মাথা গাছগুলো আবহায়া অন্ধকারে কপকপার দৈত্যের মতন যেন ছুটছে। একটা গাছে কি যেন একটা পাখীর বাসা ছিল। আমাদের গাড়ী দানবের মতন গর্জন করে তার পাশ দিয়ে যেতেই পাখীর ছানা গুলো অসহায় শিশুর মত ভয় পেয়ে ডুক্রে কেঁদে উঠলো।

রাত একটায় বাইরাগনিয়ায় পৌছলাম। এখান থেকে গাড়ী আবার ফিরে সমস্তিপুরে চলে যাবে। পাশেই ‘রক্সোলের’ গাড়ী। আমরা তাতে চড়ে পড়লুম। রাত দুটোর সময়ে আমাদের গাড়ী দীর্ঘ বিশ্রামের পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে রক্সোলের দিকে চলল। পথে ষ্টেশনের নাম গুলো—ষোড়া-চানা, চৌরদানো প্রভৃতি বেশ উপভোগ্য। ভোর-রাত্রে আমরা রক্সোলে এসে পৌছলুম। ট্রেন আমাদের রক্সোলে নামিয়ে দিয়ে ‘নাক্ কাটিমার’ ( Narktigunj ) দেশে চলে গেল।

\* \* \* \* \*

চারি দিকে গাড় অন্ধকার। গোটা দুই কেরোসিনের ল্যাম্প ষ্টেশনের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। এখন আমাদের

## নেপালের পথে

নেপালের রেলের উঠতে হবে। কিন্তু প্রধান সমস্যা, ষ্টেশান খুঁজে বার করা। এদিক, ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখি 'তার-বাবু' গভীর মনোনিবেশ সহকারে 'টরে টকা' করছেন। তাঁকে সেলাম জানিয়ে নেপালের ষ্টেশান কোন দিকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভদ্রলোক ঘাড় না তুলেই উত্তর দিলেন 'সোজা চলে যান'। গতিক স্রবিধার নয় ভেবে ফিরে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখি, দাদাটি খুব আগ্রহ সহকারে ট্রেন কখন ছাড়বে প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক এমন ভাবে মুখ তুলে চাহিলেন যে তাতে মনে হলো যে নেপালের মতন ক্ষুদ্র রাজ্যের রেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে রীতিমত অপমান করা হয়েছে। ইসারায় দাদাকে বললাম চলে আসতে। তিন জনে টিক্ করলুম রাতটা waiting roomএ কাটিয়ে সকালে খোঁজ করা যাবে। Waiting roomএর দিকে এগোচ্ছি এমন সময়ে একজন সেলাম করে জানালো যে বক্শিস পেলে সে আমাদের মুকিল আসান করে দিতে পারে। মুকিল-আসান আমাদের সাই-ডিং এর goods-train এর তলা দিয়ে, ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে, খোলা মাঠের ওপরদিয়ে

## নেপালের পথে

প্রায় মিনিট দশেক হাঁটিয়ে নেপাল মহারাজাব মুসাফির খানায় এনে হাজির করলো। সেখানে থাকতে রাজি না হওয়ায় সোজা বরাবর ষ্টেশানে নিয়ে গেল।

নেপালের ষ্টেশানটি খুব ছোট। দুটো ছোট ছোট ঘর। একটিতে টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে। একজন নেপালী ভদ্রলোক বসে কাজ করছিলেন। গুনলাম বেলা চটায় ট্রেন। মুন্সিল-আসানকে খুসী করে জিনিষ পত্র নিয়ে ষ্টেশানের এক বেঞ্চে বসে গেল।

বুধবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী

রাত্রের জমাট অঙ্ককার ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে।  
দূরে শুকতারাটা তখনও দপ্ দপ্ করছে। দিনের  
আলোর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বেড়ে উঠছে বাস্তবতার কোলাহল।  
ঘুমন্ত ধরণী যেন সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠলো।  
মাঠের মাঝখানে ছোট্ট ষ্টেশন, আর আমরা তিনটি যাত্রী।  
সুশীলবাবুকে জিনিষের পাহারায় রেখে আমরা মুখ ধোয়ার  
জল জলের উদ্দেশ্যে চললাম।

ষ্টেশনের পিছনে একটা কুয়া পাওয়া গেল। কিন্তু  
জল ভাল নয়। নিকটে জল না পাওয়ায় সেখানে  
মুখ ধোয়া শেষ করা গেল। মুখ ধুয়ে ফিরে আসছি  
এমন সময় একজন নেপালীর কাছে গুনা গেল, নিকটে  
একটা চালের কলে Tube-well আছে। দুই বন্ধুতে  
'ক্লাস্ক' নিয়ে জলের খোঁজে ছুটলাম। ফিরে এসে  
দেখি সুশীলবাবু এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে  
বেশ আলাপ জমিয়েছেন। তিনি এখানকার Station

## নেপালের পথে

staff এর একজন। বাঙ্গালীকে এতদূরে স্বাধীন রাজার রাজ্যে কাজ করতে দেখে-বেশ আনন্দ হলো। তিন জনে পথ সম্বন্ধে সমান পণ্ডিত। স্মৃতরাং তাঁকে পথের কথাই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। প্রাণ খুলে তিনি আমাদের সকল কথারই উত্তর দিতে লাগলেন।

শিবরাত্রির সাতদিন আগে থেকে যে কোন হিন্দুকে পাশ দেওয়া হয়। কিন্তু সকলকে শিবরাত্রির পরের সাতদিনের মধ্যে ফিরতেই হবে। শিবরাত্রের মেলার জগ্ন রেলের ভাড়াও অর্ধেক হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর ১/১০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১/৮। ট্রেনে আমাদের ২৪ মাইল দূবে আমলেখগঞ্জে যেতে হবে। সেখান থেকে বাসে আরও ২৪ মাইল ভীমপেড়ী। তারপর পায়ে হেঁটে তিনটি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ‘খানকোট’। সেখান থেকে আবার দশ মাইল মটরে গিয়ে, তবে পশুপতিনাথের দর্শন মিলবে। যাত্রীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। ভীমপেড়ীতে খুব রুষ্টি হচ্ছে। সেইজগ্ন যাত্রীরা এখনও নেপালের দিকে এগোতে পারেনি। রুষ্টি হচ্ছে শুনে মনটা দমে গেল। সঙ্গে একটা

## নেপালের পথে

ছাতা ও একটা water proof (বর্ষাতি) সম্বল, অথচ আমরা তিনটী প্রাণী। তখনও জান্তাম না যে রাত্রের অন্ধকারে মুন্সিল-আসানের সঙ্গে সঙ্গে সুধীরদা'র ছাতাটিও অন্তর্দান হয়েছে।

নেপালের রকসোল ষ্টেশান্ যে জায়গায় আছে তা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে lease নেওয়া। প্রায় আধ মাইল টাক দূরে একটা নদী আছে। তার একধারে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং অপর দিকে নেপালের স্বাধীন রাজ্য।

ত'এক জন করে লোকের আমদানি হতে লাগলো। টিকেটের ঘণ্টা পড়লো। অথচ পাশ-পোর্ট অফিসারের দেখা নেই। আবার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হওয়া গেল। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন,—“আমি পাশ-পোর্ট অফিসারকে খবর দিচ্ছি।”

একটু পরে Pass-Port অফিসার এলেন। একখানা এক ইঞ্চি স্কোয়ার ছাপ মারা কাগজ প্রত্যেককে দেওয়া হলো; মেয়েদের কাগজে ‘জেনানা’ এবং ছেলেদের কাগজে ‘লেডকা’ লেখা। নাম, ধাম, বা কোথা হতে আগমন এ সবের কিছু হাঙ্গামা দেখলাম না।

## নেপালের পথে

‘ইষ্টি কবচের’ মত কাগজগুলিকে সাবধানে রাখা গেল। এনজিনের নাম ‘মহাবীর’। গায়ে মহাবীরের ছবিও খোদাই-করা আছে। লাইন মিটার গেজ। বেলা ৮টায় ট্রেন ছাড়ল। নদী পার হয়ে ট্রেণ বীরগঞ্জে এসে থামল। বীরগঞ্জ ব্যবসা বাণিজ্যের একটা প্রধান কেন্দ্র। জেল, ডাক্তারখানা এবং ভাল ধর্মশালা এখানে আছে। শুনলুম অনেক মাড়োয়ারীও এখানে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করছে। এখানে সাঁকালু ও কুল কেনা হ’ল; কিন্তু সাঁকালু সেরকম মিষ্টি নয়।

বীরগঞ্জ পার হয়ে ছ’দিকে প্রসারিত মাঠ। তার উপর দিয়ে ট্রেণ চলেছে। কোনখানে উচু নীচু নেই—যেন বাংলা দেশের মধ্যে দিয়েই চলেছি। দূরে অস্পষ্ট গিরি-রাজকে মেঘের মতন দেখা যাচ্ছে। ষোল মাইল অতিক্রম করবার পর ট্রেণ আমাদের শাল এবং নানা জাতীয় গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলল। প্রায় আরও চার মাইল বন পার হয়ে ধীরে ধীরে গাড়ী পাহাড়ে উঠতে লাগল। বেলা ১১টা আন্দাজ, আমরা আমলেথগঞ্জে পৌঁছলাম।



## নেপালের পথে

ষ্টেশানটী বড় সুন্দর। চারিদিকে উচু পাহাড়। তা'র মধ্যে ষ্টেশান। যাত্রীদের থাকার জন্তু ধর্মশালা আছে নল দিয়ে ঝরণার জল একটী বড় চৌবাচ্চায় জমা ক'রা হচ্ছে। সেখান থেকে সেইজল সহরে সরবরাহ করা হয়। এখানে বেশ ভাল খাবারও পাওয়া যায়। দুই একজন হিন্দু-স্থানী হালুই-করের দোকানও আছে।

এবার বাস বা লরীতে চক্ৰিশ মাইল যেতে হবে। আগে যে সমস্ত লরী কাঠ বইবার জন্তু ব্যবহার হ'ত, এখন সেগুলো সব যাত্রী বইবার জন্তু ষ্টেশানে হাজির। দুই একটার উপরে ত্রিপুরের একটা আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে মাত্র।

ড্রাইভারের পাশে বসে গেলে পাঁচসিকা করে ভাড়া দিতে হবে। ভিতরে এক টাকা। সুশীলবাবু একটায় এবং আমরা দু'জনে আর একটায় উঠে বসলাম। ইতিমধ্যে জলযোগ সাস্ত্র করা গিয়াছে।

\*

\*

\*

প্রায় সাড়ে বারটায় লরী ছাড়লো। হিমালয়ের বুকের উপর দিয়ে মটর ছুটেছে। কোথাও নামছে আবার কোথাও দার্জিলিংএর মত চক্ৰাকারে

## নেপালের পথে

পাহাড়কে চক্র দিতে দিতে উপরে উঠছে। কোনখানে গিরি-রাজের কোন কন্ঠ্যচারী জলদ গন্তীরভাবে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র লরীখানা নিকটে যাওয়া মাত্র একটু মুচ্কে হেসে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

নীল আকাশের মেঘগুলি মাঝে মাঝে উপরে উঠবার Pass-Port না পেয়ে রক্ষীদের বৃকে মাথা রেখে কাঁদছে। কোথাও আবার বৃষ্টির জল গিরি-রাজের উপর অভিমান করে পৃথিবীর বৃকে আছড়ে পড়ছে। তন্ময় হয়ে চারিদিকে দেখতে দেখতে চলেছি। মনে হ'ল এই স্বর্গ। এরাই মানুষ। আমরা তুলোর জামা পরা বাক্সবন্দী আঙ্গুর!

হঠাৎ মটর ঘাস্ করে থামল। সামনে দেখি এক পাহাড় পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের মাঝখানে একটা বড় কাঠের দরজা। এক নেপালী বীরপুরুষ সেই দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন।

পাহাড়ের গায়ে 'চুড়িয়া' দেবীর মন্দির ও টোল অফিস। পাশেই পাহাড় ভেদ করে টানেলের পথ। টোল অফিসে টাকা জমা দেওয়াতে টানেলে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র পাওয়া গেল। দেবী দর্শন করে, টানেলে আমরা প্রবেশ

## নেপালের পথে

করলুম। টানেলটী খুব সরু ও প্রায় আধ মাইল লম্বা। একথানা মটর মাত্র যেতে পারে। বড় বড় শাল-কাঠের গুঁড়ি টানেলের পিলারের কাজ করেছে। হেড-লাইট জ্বলে হর্ণ দিতে দিতে মটর আমাদের টানেল পার করে দিল।

এঁকা বেঁকা সরু পথে মটর আবার চলা শুরু করেছে। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। ছ'থানা মটর অতি কষ্টে পাশাপাশি যেতে পারে। একটা বড় পার্বত্য নদীর পুল পার হয়ে আমাদের মটর 'তরায়ের' প্রসিদ্ধ জঙ্গলে প্রবেশ করলো।

ছধারে ঘন জঙ্গল। তার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। শুনেছি এখানে নানা বন্য জন্তু আছে। শিকারের জন্য নেপালের মহারাজা এখন এখানে এসে তাঁবু ফেলে ছেন।

বন পার হয়ে গ্রাম। এখানে অনেক লোকের বাস। পথের ধারে ধারে দোকান রয়েছে। বুদ্ধেরা বেশ আরামে তামাক টানছে আর কৌতুহলপূর্ণ চোখে নবাগতদের দেখছে।

## নেপালের পথে

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে বেলা তিনটার সময় আমরা ভীমপেড়ী বা ভীমফেরীতে পৌঁছলাম। এখান থেকে এবার পায়ে হাঁটা পথের শুরু।

\* \* \*

লরী থেকে নামতে না নামতে কুলি ডাণ্ডি-বাহক ও Custom Officerরা ঘিরে দাঁড়াল। স্ট্রেকেশ প্রভৃতি খুলে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে কিনা তার অনুসন্ধান করতে লাগল। কিছু না পাওয়াতে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাওয়া গেল। সুশীল-বাবু আমাদের আগে এসে কুলি-পর্ক শেষ করে রেখেছেন।

ছ'রকমের ডাণ্ডি দেখলুম। ইন্ড্যানিড্-চেয়ারের মত এক রকম, আর এক রকম ক্যাশিসের দোলার মতন। খানকোট অবধি ভাড়া বার টাকা। ছ'জন কুলি সাধারণতঃ ডাণ্ডি বহে নিয়ে যায়। আবার কেউ কেউ দেখলুম কুলিদের মাল বহিবার বেতের ঝোলায় বসে দিকি চলেছে।

গুটি-তিনেক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোককে সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁদের মধ্যে একজন নেপালে অনেকবার গিয়াছেন এবং পথ ষাট সমস্ত তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁদের নিয়ে আমাদের

## নেপালের পথে

দল ভারী করা গেল। আমরা সব হেঁটে চলুম। কুলি আমাদের মাল-পত্র তার বেতের ঝোলায় নিয়ে কপালের উপর থেকে একটা চামড়ায় ঝুলিয়ে পিছন পিছন আসতে লাগল।

যাত্রীরা হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে জনকতক দোকানদার রাত্রিটা ভীমফেরীতে থাকতে উপদেশ দিল। তাঁদের কাছে শুনলুম পাহাড়ের উপরে উঠলেই নাকি সন্ধ্যা হয়ে আসবে এবং আশ্রয়ের অভাবে পথে বড় কষ্ট পেতে হবে। ট্রেন এবং বাসে এতদূর আসাতে শরীরটাও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সামনে প্রকাণ্ড পাহাড়। এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে উপরে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। অতএব রাতটা এখানকার ধর্মশালায় অথবা কোন দোকানে কাটালেই ভাল হয়। কিন্তু সঙ্গী যাত্রীদল থাকতে নারাজ। কারণ ভীমপেড়ীতে রাত্রি কাটালে পণ্ডপতিনাথে পৌঁছতে শুক্রবার বিকেল হবে। শুক্রবারে শিবরাত্রি। ঐদিন বিশেষ উৎসব। অগত্যা সকলে যাওয়াই ঠিক করলাম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাজারে ছাতা কিনতে গিয়ে

## নেপালের পথে

বিফল হয়ে ফিরে এলাম। অগত্যা হারানো হাতার জন্ত  
দুঃখ প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চললাম।

সামনেই গগনস্পর্শী শিশাগড়ী পাহাড়। প্রায় আট  
হাজার ফুট উচু। এর উপর আমাদের উঠতে হবে।

পাহাড়ের ধারেই ক্যাম্প। কুলি আমাদের জিনিষপত্র  
নিয়ে সেই ক্যাম্পে ঢুকে পড়লো। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা  
করাতে জানলাম এটা কুলি রেজিষ্টারী অফিস। পাহাড়ের  
রাস্তায় কুলি জিনিষ পত্র নিয়ে যাতে চম্পট না দেয়  
তার জন্ত নেপাল গবর্নমেন্টের এই ব্যবস্থা। এখানে প্রতি  
মণ জিনিষের জন্ত তিন টাকা জমা দিতে হয়। টাকা  
জমা দিলে কুলি ও মালিকের নাম লেখা একখানা কাগজ  
দিয়ে দেয়। পথে মাঝে মাঝে ঘাঁটি আছে। সেখানে  
এই কাগজ দেখাতে হবে নতুবা কুলিকে যেতে দেবে না।

কুলি রেজিষ্টারী করে দেখি অফিসে নেপালী পয়সা,  
আনি প্রভৃতি সাজান রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম আমাদের  
টাকা পয়সা নেপালে চলবে কি না। অফিস থেকে ভরসা  
পেলাম, যে চলবে।

\* \* \* \*

## নেপালের পথে

বেলা চারটায় পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করা গেল। পথ কতকটা ‘পরেশনাথ’ পাহাড়ের পথের মতন। অল্প অল্প খাড়াই হয়ে উঠতে উঠতে টার্ণ নিয়ে আবার ক্রমে ঢালু থেকে উচু হতে আরম্ভ হয়েছে। কোথাও কোথাও ভীষণ চড়াই ও উৎরাই। পথের চারিদিকে বড় বড় পাথর ছড়ান। খানিকটা বস্ছি আবার খানিকটা হাঁটছি। এমনি করে একটা ঝরণার ধারে এসে উপস্থিত হলুম।

ঝরণার ধারে কয়েকটা ছোট ছোট খাবারের দোকান রয়েছে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, দোকান থেকে মক্কাই কিনে হু’পকেট ভর্তি করে আবার যাত্রা করা গেল।

সন্ধ্যা ছটায় শিশাগড়ীর ধর্মশালায় পৌঁছলুম। এসে দেখি ধর্মশালা সেদিনকার মত কোন এক বিশিষ্ট রাজপুরুষের অশ্বশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। হু’একটা দোকান যাও আছে তা আগে থেকেই যাত্রীতে ভরে গেছে। এর উপর Custom Officer ও সঙ্গীন কাধে নেপালী সৈন্যদের হাজিমা!

তন্ন তন্ন করে আমাদের জিনিষ পত্র ওলট-পালট করা হলো। কুলির রসিদ দেখে, তাতে একটা করে সই দিয়ে

## নেপালের পথে

ফিরত দেওয়া হলো। 'Pass-Port'গুলি বদল করে, আবার সেই রকম তিনখানা কাগজ আমরা পেলুম।

থাকার স্থানাভাবে সকলে পরামর্শ দিল যে পাহাড়ের তলায় 'কুলেখালি' বলে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে। সেখানে বড় ধর্মশালা ও থাকবার আস্তানা পাওয়া যাবে। অল্প একটু চড়াই উঠেই নামতে হবে, স্ততরাং বেশী কষ্ট হবার আশঙ্কা নেই।

অগত্যা সকলের কথামত আবার যাত্রা শুরু করলুম। ফ্রিডেটা আমার একটু বেশী বলেই প্রবাদ। কাজেই 'বয়লারের কয়লা' অর্থাৎ ঝারভাঙ্গার খাবারের হাঁড়ী বরাবর আমার হাতেই ছিল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক চলবার পর হঠাৎ মনে হলো—যা! হাঁড়ী তো Custom Officeএ ফেলে এসেছি। দাদা বল্লেন—থাক্গে। আমার

মন কিন্তু তাতে রাজি হলো না। সকলকে একটু দাঁড়াতে বলে এক ছুট দিলুম। এদিক ওদিক খুঁজে এলুম, কিন্তু কোথাও আর আমার 'বাহ্যকল্প তরু' হাঁড়ীর সন্ধান মিললো না।

মনের দুঃখ মনে নিয়েই ফিরে এলুম। আস্তে দাদা



## নেপালের পথে

বল্লে, গেছে কি আর করা যাবে, চল। কিন্তু মনে আমার  
কী যে হুঃখ, তা দাদা কী আর বুঝবে ? বল্লুম, তুমি তো  
চারটি মক্কাই চিবিয়েই দিন কাটিয়ে দিতে পার, কিন্তু  
আমার অবস্থা !

\* \* \* তুমিতো জান না

(এ) পেটের ভাবনা

চলিতে চলিতে পাথে

খাবার মিলিবে না

\* \* \* \* \*

আশা ছিল একটু উঠেই নামুতে হবে। কিন্তু যতই  
উঠি, উঠার যেন আর শেষ হয় না। দেখতে দেখতে সূর্য  
অস্ত গেল। কাল ছায়া ধীরে ধীরে গাছের উপর দিগে  
নামুতে নামুতে যেন বলছে—পথিক, থাম ! কিন্তু থামবার  
অবসর কই ?

পথের ক্লাস্তিতে সকলের মুখের কথা প্রায় একরকম বন্ধ।  
খানিকটা চলার পর দেখি দূরে গেরুয়া-পরা এক নারী-মূর্তি,  
মাথায় একটা পোটলা নিয়ে চলেছেন। আমাদের পিছনে  
দেখে ক্লাস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—“বাবা, কুলেখানি আর

## নেপালের পথে

কতদূর।” আশাস্ দিয়ে বল্লাম ‘আর বেশী দূর নেই।’ খালি হাতে চলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে দেখে আমাদের থেকে একটা লাঠি তাঁকে দিলাম। খুব খুসী হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করতে করতে তিনি তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনাতে লাগলেন। যশোর থেকে তিনি আসছেন। তাঁর সঙ্গী পথে বসন্তে মারা গিয়েছেন। তাঁর কথা শুন্তে শুন্তে আমরা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছলাম। এখানকার উচ্চতা প্রায় আট হাজার ফুট।

এইবার নামবার পালা। পথ সোজা নেমে গিয়েছে। চারিদিকে এলোমেলো টুকরো টুকরো পাথর ছড়ান। অতি সাবধানে নামতে লাগলাম। একটু একটু করে মনো আশা হচ্ছে যে এইবার বোধ হয় পথের শেষ হবে। সামনে এগিয়ে দেখি, পিঁপ্‌ড়ের সারির মতন প্রায় জন চল্লিশেক যাত্রী আমাদের মতন চলেছে। গভীর অন্ধকার হয়ে গেছে। অথচ আলোর সংখ্যা খুবই কম। বিরাট যাত্রীদল যেন পাতালের দিকে চলেছে।

আগে আগে সুশীলবাবু টর্চ হাতে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর তাঁর পিছনে আমরা এক দল চলেছি। ঘণ্টার

## নেপালের পথে

পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে। আমরা চলেছি ত' চলেছি ! সকলের মুখে এক কথা—আর কতদূর ?

সুশীলবাবু হঠাৎ পা স্লিপ্ করে পড়লেন। রাত্রে পথের মাঝে আকস্মিক বিপদে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলুম ; —উপায় ! সুশীলবাবু কোন রকমে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে চলতে লাগলেন। প্রায় রাত ন'টায় আমরা কুলেখালিতে পৌঁছলুম।

অনেক কষ্টে একখানা ঘরের আধখানা আট আনা ভাড়ায় ঠিক করা গেল। একদিকে ছ'টি কলিকাতা-প্রবাসী নেপালী আর অপর দিকে আমরা তিনটা বাঙ্গালী। তাড়াতাড়ি রান্নার আয়োজন করা হলো। সাম্নেতে একটুখানি রক ; সেইখানে কাঠের উনান অতিকষ্টে জ্বালান গেল। পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া ওভার-কোট ভেদ করে রক্ত জমিয়ে দিচ্ছে। সুধীরদা' তাড়াতাড়ি বিহান। করে সুশীলবাবুর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর পা বেশ ফুলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর। বন্ধুটী তাঁর পায়ে ঔষধ মালিস করতে বসলেন। আধ ঘণ্টা পরে খিচুড়ি নামিয়ে গিয়ে কে যে রোগী আর কে যে 'Nurse-

## নেপালের পথে

man' তা' ঠিক করে উঠতে পারলুম না। দাদাটী দেখি  
সুশীলবাবুর গায়ের উপর পড়েই বেশ নিদ্রা দিচ্ছেন।

আহারাদি সম্পন্ন করে, গরম জলে মুখ ধুয়ে একেবারে  
কম্বলের তলায়। সুশীলবাবুর গায়ে হাত দিয়ে মনে হ'ল  
জ্বর বেশ! অতটা রাস্তা হেঁটে আমাদেরও শরীর কাহিল।  
নেপালী ভাষাদের কাছে শুনলুম নিকটে কোন ডাক্তার  
নাই। ডাক্তার এক ভীমফেরীতে পাওয়া যাবে, নতুবা  
কাটাযুগুর আগে আর কোন উপায় নেই। মহা ভাবনায়  
পড়া গেল। একে অজানা দেশ, তার উপর নিকটে কোন  
ডাক্তার পাওয়া যাবে না শুনে কী যে করবো আমরা কিছুই  
ঠিক করতে পারলুম না। আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত  
দেখে সুশীলবাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—“কিছু ভয় নেই, জ্বর  
শীঘ্র কমে যাবে।’ ভাবনা থেকে পথের ক্লান্তির প্রভাব  
বেশী হ'লো। হাজার চেষ্টা করেও আমরা কেহই জেগে  
থাকতে পারলুম না।

বৃহস্পতিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী

‘কৌঁকর কৌ’

চোখ মেলে দেখি ঘরের এক কোণে একটা ঝুড়ি চাপা  
কতকগুলি মোরগ সমস্বরে ভৈরবী জুড়ে দিয়েছে। কাল  
রাতের অন্ধকারে এগুলি নজরে আসেনি।

পাশের নেপালী ছটা তল্লী-তল্লা বাঁধতে শুরু করে  
দিয়েছে। সুশীলবাবুকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কেমন  
আছেন?’

তিনি বল্লেন, জ্বর নেই, তবে ভয়ানক শীত, রোদ না  
উঠলে, উঠতে পারবো না। অগত্যা পাণ ফিরে আবার  
কম্বলখানা মাথা পর্য্যন্ত টেনে দিলুম।

একটু পরে দেখি ঘরের ভিতর একটু একটু আলো  
আসছে। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাহিরে এলুম।

সামনেই এক বিরাট পাহাড়। ক্ষুদ্র এক ঝরণা কুল  
কুল করে তার গা দিয়ে বহে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র শিশু যেমন তার  
ছ’পাশের বালিশের গুণ্ঠী তার ছোট ছোট হ’খানা হাত দিয়ে

## নেপালের পথে

অপসারিত করবার বিফল চেষ্টা করে, তেমনি নদীর অসহায় জলকণাগুলি নিরুপায় শিশুর মতন টুকরো টুকরো পাথরের বাধাকে সরাতে না পেরে অভিমানে ফুলে, ফেঁপে তার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

নির্ঝাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ চমক ভাবলো একেবারে ঝরণার ধারে গিয়ে। এক .পা, এক পা করে কখন যে ক্ষুদ্র স্রোতটীর ধারে এসে পড়েছি, তার খেয়ালই নেই। পাথরে ধাক্কা খেয়ে জলকণাগুলি অজস্র বুদ্ধদের সৃষ্টি করেছে। তার উপর সকালের নরম সূর্য্য-কিরণ পড়ে নানা রঙের আভাষ দিচ্ছে।

দারুণ লোভ হলো সেই নৃত্য-চপল হাশ্রময়ী ছোটছোট ঢেউগুলিকে হাতের মুঠোয় ধরতে। হাত বাড়িয়ে সেগুলিকে মুঠোর মধ্যে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু পরেই দেখি হাত অবশ। ঢেউগুলো যেন আমার অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে বলে গেল—‘মাটির মানুষ! কৃত্রিম জগতে বাস করে কোন্ সাহসে আমাদের পবিত্রতা নষ্ট করতে চাও!’—

চায়ের নেশা সৌন্দর্য্যের নেশাকে ছাপিয়ে উঠলো। আমাদের আস্তানায় ফিরে এসে দেখি, দাদা একটা

## নেপালের পথে

লিলিপুটিয়ান ষ্টোভ কোথা থেকে বার করে তাতে চায়ের জল চাপিয়েছেন। সুশীলবাবুকে ‘থানকোট’ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য চার টাকায় একটা ডাঙি ঠিক করে সবে চা খাচ্ছি এমন সময়ে এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের হারানো-রতন ‘হাঁড়ী’ এক কুলি মারফৎ এসে হাজির। জিজ্ঞাসা করে জানলুম শিশাগড়ীর পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছে। হাঁড়ীব সঙ্গে সঙ্গে মনে এল সাহস; নব উৎসাহে আমরা আবার রওনা হলুম।

\*

\*

\*

কুলেখালি থেকে চম্ভাগড়ি পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটা ঠিক পাহাড় নয় আবার তাকে সমতল ভূমিও বলা চলেনা। রাত্রে বরফ পড়ায় পথ একটু পিচ্ছিল। আমরা সেই ঝাঁকা ঝাঁকা পিচ্ছিল পথ ধরে এগিয়ে চল্লুম। যতই এগোই ততই একটা জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কানে আসতে লাগলো। না দেখা জিনিষ দেখবার কোতুল মনটাকে টানতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল চলার দ্রুততা।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমরা একটা পুলের কাছে এসে পড়লুম। তার নীচে দিয়ে উচ্ছ্বাল এক পার্বত্যনদী

## নেপালের পথে

উদ্দাম ভাবে ছুটে চলেছে। গভীর আবর্তনে জাগছে উন্মাদ গর্জন, নির্মম পাহাড়ে ধ্বনিত হচ্ছে তার বিপুল প্রাণ-শক্তি। পরিপূর্ণ যৌবনের আবেগে সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সে চলেছে।

ঝোলান পুলের উপর দাঁড়িয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা ছবি—শান্ত, ধীর ভাবে বহে যাওয়া বাংলা দেশের নদীর কথা। তাতে নেই যৌবনের হু'রস্তু আবেগ, নেই বাধা বিপত্তির বৈচিত্র্যতা। কেবল অতীত জীবনের স্মৃতি মাঝে মাঝে তার স্তম্ভমনে আনে বিদ্রোহের ছোঁয়াচ, বার্কিকোর দিনে তাই মাঝে মাঝে হু'কুল ভেঙ্গে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু সে সামান্য দিনের জ্ঞা; তার পর আবার সেই স্থির জলপ্রবাহ, একধেয়ে কেরাণী জীবনের মতই।

পথিকের পথের মাঝে বিলম্ব করবার অবসর নেই। আবার চলতে শুরু করলুম। সামনে পিছনে যাত্রীর সারি। উঁচু পাহাড়টা মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, আবার লোভ দেখায় তার অসুরস্তু বৈচিত্র্যতা দেখিয়ে।

কখনও আমি আগে, দাদাটী পিছনে, কখনও দাদা



## নেপালের পথে

আগে, আমি পিছনে, এমনি ভাবে চলেছি। কোথাও বা জ'জনে এক সঙ্গে। মাঝে মাঝে পথ এত নিস্তব্ধ, যে মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি যেন ধ্যান-মগ্ন। দূরে নেপালী কুমকদের কুটীর গুলি বাবুই পাখীর বাসার মত দেখা যাচ্ছে। কোথাও পাহাড়ের উপর গরু মোষ চরাচ্ছে একদল লোক, ঠিক যেন পুতুলের মতন।

কোথাও আকাশ নীল—গাঢ় নীল; আবার কোথাও টুকরো টুকরো মেঘ নানা জীব-জন্তুর আকার নিয়ে সেই অসীম নীল আকাশের বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে—কোনু বিরহীর বার্তা নিয়ে।

সহসা মনে এসে যায় বালক-স্বলভ চপলতা। মন ছুটে যেতেচায় যতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত, উদ্দেশ্য-বিহীন-ভাবে। কখনও ইচ্ছা করে সামনে উচু কাল পাথরখানায় বসে কাটিয়েদি সারাটা দিন। কী হবে পথ চলে? কিন্তু সাহস হয় না, মনের কথা কাউকে বলতে। সাথীরা হয়তো বলবে একে নেকামী, পাগলামী। মনের ব্যথা মনে নিয়েই এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে দেখি, একটা রোপ-ওয়েতে জিনিষ পত্র

## নেপালের পথে

যাওয়া আসা করছে। পথ ছুঁগম বলে পাহাড়ের উপর দিয়ে শক্ত তার টানিয়ে তাতে করে মাল-বোঝাই গাড়ীগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—ইচ্ছা করে এমনি একটা বাস্তব বসে চারিদিকের প্রকৃতিকে একবার দেখেনি।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় চক্কাগড়ি পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছলুম। আগে থেকে ঠিক ছিল এখানকার ধর্মশালায় রান্না-খাওয়া সেরে নেব। কিন্তু রান্না-খাওয়া দূরে থাক, বসতেও ইচ্ছা হলো না। বাজারের দোকানগুলিও অপরিষ্কার। চোখবুজে কোন রকমে একটা দোকান থেকে পুরী কিনে তাই খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম।

\*

\*

\*

সামনে একটু এগিয়ে চেয়ে দেখি এক বিরাট পাহাড়। তার বুক চিরে ঝাঁকা ঝাঁকা পথটী উপরে উঠে গেছে। দুবে গ্যালিভার ট্রাভেলের ছোট ছোট মানুষগুলির মত কতকগুলি লোক হামাগুড়ি দিয়ে তার উপর উঠছে। পথের দিকে চাইলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে, উঠবার স্পৃহা থাকে না। পাহাড়টার নাম চক্কাগড়ি। পাহাড় না পার হলে যখন আর আশ্রয় মিলবে না, তখন আর দেৱী না করে

## নেপালের পথে

পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করা গেল। পথটী একেবারে নীরস। কোন রকম জলের চিহ্ন নেই কোথাও। পথের ধারে ধাবে বড় বড় গাছের জঙ্গল। অনেক কষ্টে পথ চলে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা চম্পাগড়ির চূড়ায় এসে পৌঁছলুম।

এখানে পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফুট। নেপালের রাজধানীতে যাবার এইটী হচ্ছে শেষ গণ্ডী। কোন রকমে একে পার হতে পারলে, একেবারে কাট্‌মণ্ডু। সামনেই দেখি এক নেপালী কমলা-লেবু বিক্রী করছে। কমলালেবু কেনা হল, কিন্তু বেজায় টক। জলতেষ্টায় ছাতি তখন ফাটছে, টকই তখন আমাদের কাছে অমৃত। পাহাড়ের উপর থেকে চারি পাশের দৃশ্য বড় মনোরম : রাস্তাে অন্ধকারে হারানো। হিন্দুস্তানী বন্ধুদের সঙ্গে এখানে দেখা হল।

একটুখানি বসে আবার নামতে সুরু করা গেল। নামবার ছুঁটো পথ। একটা বেশ ভাল। আর একটা পিচ্ছিল ও সোজা নেমে গেছে। কুলিদের Short Cut করতে দেখে আমরা তাদের পিছন পিছন চল্লুম। সুশীল বাবু ডাঙীতে অপর পথ দিয়ে নামতে লাগলেন। আধঘণ্টা

## নেপালের পথে

নামবার পর দেখি দু'টো পথ এক জায়গায় এসে মিলেছে :  
এখান থেকে পথ ভাল। ভীমফেরীর পাহাড়ের রাস্তার  
মতন ঘুরে ফিরে নেমেছে।

একটা বিরাট অতিকায় শকুনের মত একখানা কাল  
মেঘ আকাশটাকে ছেয়ে ফেলে। আমরা জোরে জোরে  
চলতে লাগলুম। বহুদূবে থানকোটের দু'একটা ঘর দেখা  
যাচ্ছে। আশা হলো যে শীঘ্র পৌঁছতে পারবো। এমন  
সময়ে তুষার পাত আরম্ভ হলো। সাদা সাদা পেঁজা তুলোর  
মতন বরফ কাল গরম কোটের উপর পড়ে তাকে সাদা  
করে তুলল। সকলে বলে এইবার বৃষ্টি নামবে। আমরা  
ছুটতে লাগলাম। থানকোটের একটা দোকানে পা দিয়েছি  
এমন সময় খুব জোরে জল গেলো।

পাহাড়ে বৃষ্টির মজা এই যে যেমন দেখতে দেখতে  
আসে তেমনি দেখতে দেখতে থেমে যায়। খানিক পরেই  
বৃষ্টি থেমে গেল। দোকান থেকে প্রায় আধ মাইলটাক  
দূরে ট্যাক্সি ও লরীর আড্ডা। এখান থেকে মটরে আরো  
দশ মাইল গেলে পশুপতি-নাথের মন্দিরে পৌঁছন যাবে।  
পাঁচ টাকায় আমরা তিনজন ও আরও দুইজন যাত্রী

## নেপালের পথে

মিলে একখানা ট্যাক্সি ঠিক করলুম। সমস্ত জিনিষ পেয়েছি বলে কুলির রসিদে সই করে দিয়ে, আমরা মটরে চেপে বসলুম।

উঁচু নীচু পথ দিয়ে মটর ছুটে চলেছে। চারি দিকের পাহাড় গুলি কখন দৌড়ে কাছে আসছে, আবার পরক্ষণে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা। বিকেলেই মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মাফ্লার দিয়ে কানটান ঢেকে বসে আছি। ড্রাইভার পথের পরিচয় দিতে দিতে চলেছে। অবশেষে মটর কাটমণ্ডু সহরে এসে পৌঁছল।

\* \* \* \*

সামনে দেখি দার্জিলিং এর লেবং এর ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মতন প্রকাণ্ড মাঠ। সেখানে নেপালী-সৈন্যরা কুচ্কাওয়াজ করছে। একদল সৈন্য মাচ' করতে করতে আমাদের পথের উপর এসে পড়লো। তাবলুম সৈন্যরা যতক্ষণ না যাবে ততক্ষণ আমাদের গাড়ী সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার মূল্য কি তা তারা বেশ বোঝে। সৈন্যরা হুঁভাগ হয়ে মটরের পথ করে দিল।

## নেপালের পথে

মটর চালকের নিকট গুনা গেল যে কাল শিবরাত্রি  
উপলক্ষে বেলা দু'টায় এই ময়দানে কুচকাওয়াজ হবে,  
তারই রিহার্সাল এখন চলছে। কাট-ম'গু থেকে পশুপতি-  
নাথের মন্দির প্রায় চার মাইল। আমরা বেলা পাঁচটা  
আন্দাজ পশুপতি-নাথে এসে পৌঁছলুম।



নেপালের পথে



পশুপতিনাথের মন্দির।





নেপালের পথে

সুধীরদাস র. কথা



রমেশ বড় যুদ্ধিলে ফেল্লো। কিছুতেই তার আর বাড়ী  
 পহন্দ হয় না। কুর্ল ও জিনিষের ভার আমার উপর দিয়ে  
 বন্ধু ভাল বাড়ীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। একা চুপ-চাপ  
 দাড়িয়ে আছি। সামনেই পশুপতিনাথের মন্দির। যাত্রীরা  
 সব কোলাহল করে দেব দর্শনে চলেছে। জানি না পশুপতি-  
 নাথের কী আকর্ষণ, যার জন্তে মানুষ পাগল হয়ে তার শ্রাস্ত,  
 ক্লাস্ত দেহটাকে এ পর্য্যন্ত টেনে এনেছে।

মনে পড়ল, কালকের সেই শিশাগড়ী থেকে কুলেখালি  
 যাওয়া। একে রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তার উপর পথ পিচ্ছিল  
 ও কঙ্করময়। প্রায় চল্লিশজন—বেশীর ভাগ বৃদ্ধা—সার দিয়ে  
 সেই অন্ধকারের ভিতর অতি কষ্টে পথ করে চলেছে। সঙ্গে  
 হারিকেন দুটি অন্ধকারের গোলক-ধাঁধা সৃষ্টি করে পথিক-  
 দের আরও বিভ্রান্ত করে তুলছে। পাহাড়ের কনুকের  
 হাওয়া যাত্রীদের বুকের হাড়গুলোকে পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে,  
 তবুও তাদের চলার বিরাম নেই। কিন্তু কেন? কিসের  
 আশায়? হয় তো এত কষ্টের পর মন্দিরে গিয়ে দেখবে

## নেপালের পথে

সেই একই শিব-লিঙ্গ যা আমাদের বাংলা দেশের প্রতি ঘরে ঘরে আছে। তবে কি এতটা কষ্টের কোন সার্থকতা নেই? এতগুলো লোক অন্ধভাবে শুধু কি একটা আগ্নেয়ার পিছনে ছুটে এসেছে? যদি প্রতি মন্দিরের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে—যদি এ সব শুধু লোকাচারই হয়, তবে কষ্ট সহ্য করবার এ বিপুল শক্তি মানুষ পেলো কোথা থেকে? হুঁধারে নিশ্চিত মৃত্যুর আহ্বানের ভিতর দিয়ে স্বার্থ-লোভী সংসারী মানুষ সকলের চেয়ে যে প্রিয় জীবন তাকে পর্যাস্ত তুচ্ছ করে এত দূরে ছুটে আসে, সে কি পথের বৈচিত্র্যতার জন্ম? তাই যদি হয়, তবে ক্ষীণ-দৃষ্টি, ভগ্নদেহ, স্থবির রুদ্ধার দল এ বিপুল প্রাণশক্তি কোথা থেকে পায়?

এ রকম কত কি ভেবে চলেছি, এমন সময়ে রমেশ পিছন থেকে জানিয়ে দিল এখানকার সব বাড়ীই সমান। ঘরগুলো ছোট ছোট। উঠে দাঁড়ালে মাথায় কড়ি কাঠ এসে লাগে।

সামনের একটা বাড়ীর তিন তলায় একখানা ঘর ঠিক হ'ল। যতদিনই থাকি না কেন সব শুদ্ধ আমাদের তিনটাকা ভাড়া দিতে হবে। বিছানা করে স্নানীলবাবু

## নেপালের পথে

শুয়ে পড়লেন, আর আমরা ছ'জনে মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

পশুপতিনাথের মন্দির :—

মন্দিরের সিং-দরজা দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। সামনেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যখানে স্বর্ণের ছাউনীযুক্ত পশুপতিনাথের মন্দির। চুড়ায় তার স্বর্ণ-পতাকা ও ত্রিশূল। মন্দিরের সামনেই পশুপতিনাথের বাহন স্বর্ণমণ্ডিত ছুটি ঘুং—একটি বড় এবং অপরটি ছোট। তার এক পাশে গরুড়-স্তম্ভ ও সর্বসিদ্ধি-দাতা গণেশজীর মূর্তি। আশে পাশে আরো ছোট-খাট অনেক দেবমূর্তি রয়েছে। সর্ব-সিদ্ধি-দাতাকে প্রণাম করে আমরা পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে চললাম।

শ্বেত-পাথরের মন্দিরের চারিধারে বড় বড় ঘরের ছায়া বারান্দা। বারান্দার চার কোণে নানা কারুকার্যময় চারিটি রৌপ্য দ্বার। প্রত্যেক দরজা রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই রেলিং এর সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের দেবদর্শন করতে হয়। ভিতরে কালো মসৃণ পাথরের বেদীর উপর পঞ্চমুখী

## নেপালের পথে

শিবলিঙ্গ। মাথায় পাঁচটী স্বর্ণমুকুট—তার উপর পাঁচটী স্তব্ধের ছাতা। পত্র, পুষ্প ও মাল্যে মহাদেবের এখন রাজবেশ। মন্দিরের উর্দ্ধভাগ ছাউনীয়ুক্ত প্যাগোডার আকার বিশিষ্ট।

দেশ দেশান্তর হতে যাত্রীরা এসে এই কাঠের রেলিং ঘেরা অপ্রশস্ত দরজার সামনে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের গ্রহরী তার ব্যাটুন্ দিয়ে দরজার সামনে থেকে ভিড় সরিয়ে সকলের দেখবার সুবিধা করে দিচ্ছে। গ্রহরীব হাতে ব্যাটুন দেখে চমকে উঠলুম। চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা মুখ—কিন্তু সে মুখ আর এ মুখে অনেক তফাৎ।

প্রাণভরে ভগবানকে দর্শন করা গেল। মনে মনে বল্লুম—‘প্রভু, তুমি ত’ পশুদের পতি। আমাদের পশুত্ব দূর করে মানুষ করে দাও।’

\* \* \* \* \*

মানুষের স্বাধীনতার ভিতর যখনই একটা গম্ভীর এসে পড়ে, মনে তখন জেগে উঠে একটা অতৃপ্তি। মন্দিরের রেলিংএর সামনে থেকে এত ভাল করে দেবদর্শন করেও

## নেপালের পথে

প্রাণে শাস্তি এল না। মনে হতে লাগল, যদি আরও নিকটে যেতে পারতুম……কিন্তু সে যে হবার নয়। চোখেব সামনে ফুটে উঠল ‘হরিজনদের’ ব্যথা। অনেক দিন আমিও বন্ধুহলে তর্ক করেছি যে, যদি বাহিরে থেকে দেবমূর্তি দর্শন করা যায় তবে কি তাতে তৃপ্তি আসে না? কিন্তু আজ প্রথম অনুভব করলুম তাদের ব্যথার কি জ্বালা।

এখানকার লোকদের নিকট হতে শুনতে পেলুম নেপালের মহারাজাধিরাজ ও পশুপতিনাথের পুরোহিত ব্যতীত আর কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। ভক্তদের সামনে থেকে ভগবানকে সরিয়ে রাখবার ফারণ নাকি দুটি।

এখন যেখানে মন্দির, সেখানে অনেক দিন থেকে একটি পরশ-পাথর ছিল। এর স্পর্শে এলে যে কোন জিনিষ সোনা হয়ে উঠত। অনেকে আবার এই পরশ-পাথরকে দেবতা বলে পূজা করতো। কোন এক অন্ধকার রাত্রে এক লোভী সাধু তার জুতার ‘নালটি’ পরশ-পাথরের মাথায় চাপিয়ে দেয়। নালটি সোনা হয়ে উঠবার



## নেপালের পথে

সঙ্গে সঙ্গে সাধু মারা গেল। ওদিকে নেপালের মহারাজা স্বপ্ন দেখলেন কে যেন তাঁকে এসে বলছেন—  
'ওরে, আর যে পারি না। জুতা শুদ্ধ যে আমার মাথায় উঠল।' মহারাজা তখন এই মন্দির তৈয়ারী করে দিলেন। সেই থেকে সাধারণের প্রবেশ বন্ধ। এখানকার এই শিব লিঙ্গের তলায় সেই পরশ-পাথর আছে। সেইজন্য পশুপতিনাথের আর এক নাম পরেশনাথ।

আবার কেউ কেউ বলেন প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মন্দিরের পুরোহিত দণ্ডীদের নিয়ে। তাঁরা মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। দেশ থেকে আসবার সময়ে তাঁরা তাঁদের দেশের ছুঁ-মার্গ এনেছেন। তার ফলে এই বাধার সৃষ্টি।

বাড়ী ফিরে দেখি অবস্থা শোচনীয়। নীচের এক তলায় গোটা দশেক উন্নত জ্বলছে। কাঠের ধোঁয়ায় বাড়ী প্রায় অন্ধকার। সিঁড়ী দিয়ে অতিকষ্টে উপরে উঠে দেখি স্মশানবাটু দরজা জানুলা ভেজিয়ে কঙ্কালমূড়ি দিয়ে বসে আছেন। তাঁকে জড়ুগৃহে ফেলে রেখে বাওয়াতে একেবারে চটে অস্থির। বন্ধু তাড়াতাড়ি চা করতে বসল দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

## নেপালের পথে

চা খাইয়ে বন্ধু হাতা-খুস্তি নিয়ে বসে গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে চিঠি লিখতে বসে পড়লুম। কাট-মণ্ডু সহরে British legation ; সেখানে গিয়ে চিঠি ফেলে আসতে হবে। নতুবা শীঘ্রই চিঠি পৌঁছবে বলে আশা হয় না। পথে সুলীলবাবুর বীরত্বের কথা জানিয়ে দ্বারভাঙ্গায় একটা পত্র লিখলুম।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার সুগন্ধ আমাদের ক্ষিদেটাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। এমন সময়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাদের ঘরের সামনে এসে বসে পড়লেন। তাঁর চুলগুলি সব সাদা—এমন কি ভুরুতেও পাক ধরেছে। তাঁকে দেখে আমাদের মুখর্যো মশাযেব কথা মনে পড়ে গেল। আমরা ব্রাহ্মণ গুনে জোড় হস্তে প্রণাম করে জানিয়ে দিলেন তিনি আমাদের পাশের ঘরের বন্ধু। ঘরের ভিতরে এসে বসবার জন্ত তাঁকে অনুরোধ করলুম। কিন্তু আমাদের ‘সেবা’ প্রস্তুত দেখে বাহিরেই বসলেন।

না। কথার পর খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা হেঁটে না ডাঙিতে এসেছি। বন্ধু উত্তর দিল—‘হেঁটে।’

## নেপালের পথে

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—আমিও মশাই তাই। ঐ যে পাহাড়টা, চম্ভাগড়ী না কি যে নাম, সেখানে এসে, বুঝলেন, পাহাড়ের চেহারা দেখে আর হাঁটতে ভরসা পেলুম না। একেবারে একটা কুলির ঝোলাতে চেপে বসলুম।

ভদ্রলোকটির নাম মাখনলাল। আমরা তাঁর সঙ্গে দাদা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলুম। তাঁর ভগ্নী ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি এখানে তীর্থ করতে এসেছেন।

বন্ধুটি আস্তে আস্তে বলে উঠল—কুলির ঝুড়িটা ভেঙ্গে পড়েনি ত’।

মাখনদা মুঁচকে হেসে বল্লেন—আরে সে কি ভাগ্যবান ঝুড়িরে ভাই!

মাখনদা’র নিকট হতে খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি দেখবার আছে। বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে রামেশ্বরজীকে নিয়ে তাঁরা এখানকার সমস্ত মন্দির দেখে এসেছেন। কালকে তিনি ও পাড়ার কয়েকজন মিলে লরী ঠিক করে ‘নীলকণ্ঠ’ দেখতে যাবেন; ইচ্ছা করলে আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতে পারি। রমেশ জানিয়ে দিল, যে

## নেপালের পথে

কদিন আমরা এখানে আছি, তাঁকে আর ছাড়ছি না।

শুক্রবার—২১শে ফেব্রুয়ারী।

পাঁথ ও ঘণ্টার শব্দে ঘুমটা গেল ভেঙ্গে। মনে হল আবার বুঝি বাংলা দেশে ফিরে এসেছি। কানে এল মহা-দেবের স্তব। মনে পড়ল শিবরাত্রির কথা। বন্ধুকে তাড়া-তাড়ি ঘুম থেকে টেনে তুললুম। শীঘ্রই স্নান সেরে মন্দির দর্শন করে মাখনদা'র Regimentএ আবার যোগ দিতে হবে। সুশীলবাবু ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে জোর জোর পা ফেলে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর পা all right।

ছোট্ট জানালা দিয়ে দূরের নীল আকাশের কোলে বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে—ঠিক যেন কয়েকজন ঋষি ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে আছেন।

বন্ধুটিকে নিয়ে স্নানের জন্ত বেরিয়ে পড়লুম। পশুপতি-নাথে কল আছে, কিন্তু প্রতি বাড়ীতে নেই। রাস্তার মাঝে মাঝে এক একটা কল আছে। কাট-মণ্ডু সহর থেকে এই জল আসে। আমাদের বাড়ীর ছ'পাশে ছ'টা কল।

## নেপালের পথে

একটা দেখলুম মেয়েরা দখল করে আছেন। অগুটির কাছে গিয়ে দেখি তার অবস্থাও সেইরূপ। কনুকে হাওয়া দেখে স্নান করতে ভরসা হ'ল না। অনেক কষ্টে একটু জল যোগাড় করে মাথাটা ধুয়ে ফেলা গেল।

বাড়ী এসে মাখনদার সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লন ঘণ্টাখানেক পরে তাঁরা নীলকণ্ঠে বাবেন। রামেশ্বরকে সঙ্গে করে নিকটের দুই একটা মন্দির দেখবার জন্য আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম।

গৌরী গঙ্গা :—

রামেশ্বরের সঙ্গে আমরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলুম। সিঁড়ী দিয়ে নীচে খানিকটা নেমে দেখি একটা পার্বত্যনদী ( বাঘমতীর অংশ ) তর তর করে বয়ে চলেছে। বাঁধান ঘাটের উপর থেকে স্বচ্ছ জলের তলার বালি দেখা যাচ্ছে। দুই একটা পাথর জলের ভিতর থেকে মাথা উচু করে জানিয়ে দিচ্ছে তার উৎপত্তি স্থানের কথা। নদীর নাম গৌরী গঙ্গা। জল স্পর্শ করে আমরা মহাদেব দর্শন করলুম। সেখান থেকে সূর্য্যঘাট হয়ে গুহেশ্বরীর মন্দিরে চললাম।

নেপালের পথে



মঞ্জুশ্রী ।



## নেপালের পথে

শ্রীকেশবী মন্দির :—

দক্ষমন্ডে সতী দেহত্যাগ করলে, বিষ্ণুচক্রে তাহা একান অংশে বিভিন্ন হয়। দেবীর জানুঘর এখানে এসে পড়ে। তাই দেবী এখানে গুহুকালী। প্রশস্ত চত্বরের উপর ছোট মন্দির। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়। একটা বেদী সোনা দিয়ে মোড়া। সেই বেদীকে দেবীর মূর্তি বলে পূজা করা হয়। মন্দিরের উপরটা সোনা দিয়ে মোড়া। চুড়ায় চারিটা সোনার ফলা ও তরবারি রয়েছে—তার পার্শ্বে একটা স্বর্ণ কলস। মন্দিরের চারিপাশে গণেশ-স্তম্ভ, গরুড়-স্তম্ভ ও ভৈরব স্তম্ভ প্রভৃতি রয়েছে। সেখান থেকে মঞ্জুশ্রীর মূর্তি দর্শন করে পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে চলাম।

মঞ্জুশ্রী :—

নেপালের অসংখ্য দেব দেবীর মধ্যে মঞ্জুশ্রী খুবই ভাগ্যত। রামেশ্বরজীর নিকট হতে এই সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প শুনা গেল। এখন যেখানে কাট্‌মণ্ডু সহর, পূর্বে সেখানে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। হ্রদের চারিপাশে বড় বড় পাহাড়। মঞ্জুশ্রী চীন দেশ থেকে নেপালে বাস করবার জন্য আসছিলেন। পশুপতিনাথের দিকে যাবার পথের



## নেপালের পথে

সামনে তাঁর এই কাট্-মণ্ডুর হুদ পড়ল। তিনি তাঁর অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি তরবারি দিয়ে পাহাড়ের এক স্থানে একটি গর্ভ করে ফেলেন। হৃদের সমস্ত জল পাহাড়ের গর্ভেব ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাষ্মতী নদী হয়ে গেল। পরে সেই স্থানে একটা সহর গড়ে উঠে। সেই জন্তু সকলে সহরকে কাট্-মণ্ডু বলে থাকে।

মঞ্জুশ্রীকে দর্শন করে আমরা পশুপতিনাথের মন্দিরে এলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে এল দেখে রামেশ্বরকে পাঠালুম মাখনদা'কে খবর দিতে। বলে দিলুম আমরা মিনিট দশেকের ভিতর যাচ্ছি, তিনি যেন অনুগ্রহ করে আমাদের জন্তু অপেক্ষা করেন।

আজ শিবরাত্রির বিশেষ উৎসব। সাধু, সন্ন্যাসী ও যাত্রীর কোলাহলে মন্দির মুখরিত। চারিটা ঘর খোলা। কিন্তু লোকের ভিড়ের জন্তু রেলিং অবধি যাবার উপায় নেই। যাত্রীরা যদিও কোন রকমে কাঠের গাভীর সামনে পৌঁছয়, কিন্তু হাতের ফুল দেবতার পায়ে পৌঁছল কি না দেখবার আগেই তাদের অনেক দূরে সরে যেতে হচ্ছে। হিন্দুস্থানি ভাষাদের লোটোর জলে জামা ভিজ়ে উঠল।

## নেপালের পথে

রমেশের বীরছে আমাদের একবার ক্ষণিকের জন্য দেবদর্শন  
ংল।

রামেশ্বর এসে খবর দিল মাখনদা' বা তাঁর দলের  
কাহারও সঙ্গে তার দেখা হয় নি। বাড়ী এসে দেখি  
মাখনদা'র ঘর তাল। বন্ধ। একটু বিশ্রাম করে আবার  
বেরিয়ে পড়লুম যদি আর কোন দলের সঙ্গে ভিড়তে  
পারি। লরীর আড্ডায় এসে দেখি এক দল চলেছে।  
তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করা গেল। ঠিক হ'ল আমরা ভাটগাঁও,  
নীলকণ্ঠ হয়ে বাইশ ধারায় যাবো। তারপর কাট-মধু  
হয়ে পশুপত্তিনাথ। ভাড়া আমাদের প্রত্যেককে একটাকা  
তিন আনা দিতে হবে।

সামনেই তুষার আবৃত পাহাড়। কোন কোন  
পাহাড়ের উপর সূর্য্যের আলো পড়াতে বরফ গলে সেখানে  
ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আবার কোথাও বরফ গলতে থাকার  
সেখানে পাহাড়ের স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। মর্ত্তের লোককে  
যেন পাহাড় জানিয়ে দিচ্ছে যে গিল্টি-করা জিনিষ বেশীদিন  
থাকে না—একদিন না একদিন তার স্বরূপ বেরিয়ে  
পড়বেই। বাঘমতী নদী পার হয়ে উচু নীচু সৰু পথ দিয়ে

## নেপালের পথে

আমরা এই বরফ ঢাকা পাহাড় ধরবার জ্ঞা ছুটেছি। কিছু যত এগিয়ে চলি, পাহাড় যেন তত পেছিয়ে যায়। এইরকম লুকোচুরির ভিতর দিয়ে মাইল আষ্টেক যাবার পর ভাটগাও সহরে এসে পড়লুম।

ভাটগাও :—

১৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভূপতীন্দ্র মল্ল ছিলেন নেপালের রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল এই ভাটগায়ে।

বিখ্যাত দরবার কক্ষ তাঁরই সময়ে নিৰ্ম্মিত হয়। এই কক্ষের দ্বারগুলি স্বর্ণময়। সামনেই মহারাজার ব্রোঞ্জের মূর্তি। একপাশে একটা পিতলের ঘণ্টা। এই ঘণ্টা বাজালে প্রজারা রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে মহারাজার কাছে তাদের অভিযোগ জানাত।

পঞ্চস্তর মন্দির :—

রাজ-প্রাসাদের নিকটে পঞ্চস্তর মন্দির। পথ-প্রদর্শক জানিয়ে দিলে এই মন্দিরের এক একখানি ইট মহারাজ ভূপতীন্দ্র মল্লের হাতের গাথা। যদিও তিনি এদিকে খুব সৌখিন ছিলেন কিন্তু শিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ

নেপালের পথে



পঞ্চস্তর মন্দির (ভাটগাঁও)



## নেপালের পথে

ছিল। এই মন্দিরটি দেখলে তাঁর শিল্প-প্রীতিব কথা মনে পড়ে।

পাঁচটি ধাপ দিয়ে মন্দিবে উঠতে হয়। প্রথম ধাপে রাজপুত বীরের প্রতিমূর্তি; দ্বিতীয় ধাপে দুইটি প্রস্তরেব হস্তী, তৃতীয় ধাপে সিংহ; চতুর্থ ধাপে শেন-সিংহ এবং পঞ্চম ধাপে সিংহ ও বাঘিনীর মূর্তি। তাস্তিক দেবতাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবার কথা ছিল, কিন্তু কি জানি কোন কারণবশতঃ এখানে আর দেবতার প্রতিষ্ঠা হয় নি। নেপালীদের ধারণা এখানে ভৈরব বাস করেন। পাঁচধাপ মন্দিরের উপর পাঁচতলা প্যাগোডার তি চুড়াটা এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

দত্তাত্রেয় মন্দির :—

এক সময়ে সূক্ষ্ম কারু-শিল্পে নেপাল যে কত উন্নত ছিল, তা এই মন্দিরটি দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায়। মন্দিরের ভিতর দত্তাত্রেয় ঋষি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি। দত্তাত্রেয় মন্দিরের সামনে একটি ছোট মন্দির আছে, সেখানে ভীম ও দ্রোপদীর মূর্তি।

এখানকার পথগুলি খুব সরু সরু। তার দুধারে সাত

## নেপালের পথে

আট তলা বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীর জানালা, দরজার উপর নক্সা কাটা। কোথাও আবার সূক্ষ্ম জালতি দিয়ে জানালা তৈয়ারী হয়েছে। কিন্তু গত ভূমিকম্পে অনেক বাড়ী ও মন্দির একেবারে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে।

নীলকণ্ঠ :

ভাটগাঁও থেকে ফিরে আবার পশুপতিনাথের রাস্তায় এসে পড়লুম। সেখান থেকে কাট-মধুব উপর দিয়ে আমরা নীলকণ্ঠে পৌঁছলুম। পশুপতিনাথের মন্দির থেকে নীলকণ্ঠ প্রায় মাইল দশেক। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের (খুব সম্ভব চম্পাগড়ীর অংশ) তলাতে নীলকণ্ঠের মন্দির। দেবতার নাম শুনে ভেবেছিলুম মহাদেবের মন্দির, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে দেখি বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা।

পাথরদিয়ে একটা চৌবাচ্চার মত করা হয়েছে 'ঝরণার জল এসে সেই চৌবাচ্চায় জমা হচ্ছে। সেই জলের ভিতর বিরাট পুরুষ, চতুর্ভূজ নীলকণ্ঠের অনন্তশয্যা। হস্তে গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র। মাথা এবং হাতের উপর সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে।

মন্দিরের চারিদিকের দৃশ্য বড় মনোরম। একদিকে

নেপালের পথ



দেবদেব (ভাটগাঁও)





## নেপালের পথে

পাহাড় আর অপর দিকে অনন্ত প্রসারিত মাঠ। মাঠের উপর একটা ছোট বাড়ী। বাড়ীটা গুনলুম থাইসিস-ওয়ার্ড।

বাইশধারা—

নীলকণ্ঠ থেকে আমরা বাইশ-ধারাতে চলাম : বাইশধারা কাট-মণ্ডু সহরের খুব নিকটে। এখানে একটা ছোট চৌবাচ্চার জলের ভিতর বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা। কেহ কেহ বলেন নীলকণ্ঠে বিষ্ণুর মূর্তি আপনা হতে হয়েছে, আর এখানকার মূর্তি কোন একজন মহারাজার তৈয়ারী।

চারিদিকে সুন্দর প্রশস্ত বাগান। বাগানের ভিতর একটি বড় চৌবাচ্চায় নানা রঙ্গের মাছ রয়েছে। হরিষারের মত বড় শোল, লাল ও নীল মাছ এইজলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। অনেকে এই মাছের জন্তু মুড়ি ও হোলা ভাজা জলে ফেলে দিচ্ছে।

এই চৌবাচ্চার বাঁধান পাড়ের উপর বাইশটা নল দেওয়া আছে। সেখান দিয়ে ঝরণার জল বাইশ ধারাতে এসে বাহিরে পড়ছে। সেইজন্তে এই জায়গার নাম হয়েছে বাইশ-ধারা।

## নেপালের পথে

বাইশধারা থেকে আমরা কাট-মুণ্ডু সহরে এসে পড়লাম।  
সৈনিকদের কুচকাওয়াজ হবে বলে Parade ground-এ  
অনেক লোক সমবেত হয়েছে। আমরাও লরী থেকে নেমে  
পড়লাম।

সেনাদের কুচ-কাওয়াজ :—

নেপালের মহারাজা থেকে সামান্য নেপালী কুলিও  
পশুপতিনাথকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন।  
নেপাল-বাসীদের বিশ্বাস যে স্বয়ং ভগবান পশুপতিনাথের  
দয়ায় তারা আজ বিশ্ব-দরবারে স্বাধীন বলে সম্মান পেয়ে  
আসছে। শিব-রাত্রির দিন পশুপতিনাথের বিশেষ উৎসব।  
এই পবিত্র দিনটা তারা নানা সামরিক কুচকাওয়াজের  
ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দেয়। বেলা তিনটের সময় মুহূর্মুহঃ  
কামানের গর্জনের সঙ্গে mock fight আরম্ভ হ'ল।  
কামানের গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে  
নেপালের বীরত্বের কথা জগতবাসীকে জানিয়ে দিল।  
ঘণ্টাখানেক পরে নকল যুদ্ধ শেষ হ'ল।

\* \* \* \*

কাট-মুণ্ডু সহরের ভিতরে আমাদের চাঁদনি-চকের মত

## নেপালের পথে

প্রকাণ্ড বাজার—নাম ইজ্জচক্। কাল এখানে এসে ভাল করে দেখা যাবে বলে তাড়াতাড়ি একবার বাজারটা ঘুরে পশুপতিনাথের দিকে রওনা হওয়া গেল।

কাট্‌মণ্ডু সহর থেকে পশুপতিনাথের মন্দির প্রায় মাইল চারেক। লরী পাওয়া গেল না বলে হেঁটেই চলুম। সুশীলবাবুর খুব কষ্ট হতে লাগল—কিন্তু কোন উপায় নেই। পথে এক নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি কলিকাতায় অনেক দিন ছিলেন। তাঁর নিকট হতে নেপাল সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া গেল।

নেপালের মহারাজাধিরাজ হচ্ছেন প্রকৃত রাজা। তিনি হচ্ছেন পাঁচ-সরকার। প্রধান মন্ত্রীকে কেউ কেউ মহারাজা বলেন। তিনি হচ্ছেন—তিন সরকার। সমস্ত রাজ্যশাসনের ভার এই প্রধান মন্ত্রীর উপর। প্রধানের পরে একজন Viceroy আছেন। প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তিনি রাজ্য শাসন করে থাকেন। মহারাজাধিরাজ ও প্রধান মন্ত্রী এখন শিকারের জন্তু ভৌমফেরীর জঙ্গলে আছেন। কাট্‌মণ্ডু সহরের ভিতর 'British legation'। এখানে ব্রিটিশ-রাজদূত বাস করেন। তাঁদের আলাদা

## নেপালের পথে

টেলিগ্রাফ লাইন ও চিঠি পত্র পাঠাবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সেখানে চিঠি ফেলে বা তার করলে তবে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পৌঁছবে। নেপালের নিজদের mint (টাকশাল) আছে। সেখানে টাকা, পয়সা, পাই-পয়সা, এমন কি মোহর পর্য্যন্ত তৈয়ারী হয়।

নেপালী পুরুষ ও মহিলারা নানা বেশভূষা কবে পশুপত্তিনাথ দর্শনে চলেছেন। একটা সোজা পথ ধরে আমরাও যাচ্ছি ; তবুও যেন পথ কমে না ! পাশে একটা বড় পুকুর দেখা গেল, কিন্তু জল খুব কম। আমাদের নেপালী বন্ধু বল্লেন যে, যখন হর-ধনু ভঙ্গ হয় তখন সেই ধনুকের খানিকটা অংশ সীতামারীতে ( জনকপুর ) এবং খানিকটা নেপালের এই পুকুরে এসে পড়ে। সেইজন্ম এই পুকুরটা একটা বড় তীর্থ-স্থান। তখনও ভাবতে পারিনি যে এই তীর্থস্থান নিয়ে রমেশ পরে একটা ফ্যাসাদ করে বসবে।

\* \* \* \*

সন্ধ্যার একটুপরে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। এতটা

## নেপালের পথে

ইটাতে সুশীলবাবুর পাটা বেশ টন্ টন্ করছে ;  
তবুও সন্ধ্যা-আরতি দেখতে আমাদের সঙ্গে  
চলেন ।

আরতির দৃশ্য বড় চমৎকার । চারিদিকে ঘূতের প্রদীপ  
জ্বলছে । অনেক সাধু সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে বসে জপ ও পূজা  
করছেন । কেউ কেউ খালি গারে ছাই মেখে তজন  
গাহিছেন । একটু এগিয়ে দেখি নেপালের Viceroy,  
তাঁহার স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন । মনে  
পড়ল আমাদের দেশের কথা । যদি কোন বড়লোক যান  
মন্দিরে পূজাদিতে, গরীবদের প্রায় এক ক্রোশ দূর  
সরে যেতে হয় ! কিন্তু স্বাধীন দেশে সবাই  
স্বাধীন । রাজ-পরিবারের পাশ দিয়ে কত লোক চলেছে,  
কিন্তু কারো কোন আপত্তি নেই । দেবতার চোখে সব  
ভক্টই সমান তাঁর কাছে কোন ভেদাভেদ থাকতে  
পারে না ।

সকালের চেয়ে ভিড়টা এখন অনেক কম । সমস্ত দিন  
ধরে ভগবানকে দেখবার জন্য যারামারি করে যাত্রীরা  
এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । রাত্রে মন্দির খোলা থাকবে

## নেপালের পথে

শুনে সকলেরই আশা হয়েছে, অদৃষ্টে তাদের আজ দেব-দর্শন নিশ্চয়ই ঘটবে।

মন্দিরের রেলিং এর সামনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে আরতি দেখছি। চোখে পড়ল রাজ-পরিবারের লোকেরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা পশু-পতিনাথকে নিবেদন করছেন। আরতি শেষ হয়ে গেল; পূজারী এসে আশীর্বাদী ফুল আমাদের দিয়ে গেলেন।

বাড়ী ফিরে দেখি মাখনদা' তাঁর ঘরে বসে আছেন। আমরা ফিরেছি জানাবার জন্তে বন্ধুটি বেশ শব্দকরে দরজা খুলে ফেলেন। কিন্তু মাখনদা' আমাদের চেনেন বলে মনে হ'ল না। তারপর অনেক বার আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে তাঁকে যেতে আসতে দেখা গেল কিন্তু আমাদের সঙ্গে একটী কথাও তিনি বলেন না।

অনেক যাত্রীরা চলেন মন্দিরে রাতটা কাটাতে। বামেখর একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত। মশালটা সে সমস্ত রাত মন্দিরে জ্বালাবে। বন্ধু তাকে খুব ভোরে এসে আমাদের আর যা কিছু দেখবার আছে, সেখানে নিয়ে যাবার জন্ত বলে দিল।

## নেপালের পথে

রাত অনেক হয়েছে দেখে গুরে পড়া গেল। মাঝে মাঝে ভাঙ্গাদেওয়ালের ভিতর দিয়ে মাখনদা'র আয় ব্যয়ের হিসাব কানে আসতে লাগল।

শনিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী:—

ক্ষুদ্র জানালাটিতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। কিন্তু শীতের জন্ম কখন ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। মাখনদা'র ঘর থেকে শব্দ ভেসে এল—‘এ রামেশ্বরজি! হাম্ যদি মিঠাই পুরী তোম্ লোকে কিনি দেগা, তোম্ কি সেবা নেহি করে গা?’ বজুটি যে এতক্ষণ জেগেছিল, তা বুঝতে পারিনি। আহারের নিমন্ত্রণ হচ্ছে শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠল। আমাদের সকলকে কন্বলের ভিতর থেকে টেনে তুলে জানিয়ে দিল যে আমাদের মত সং ব্রাহ্মণ থাকতে মাখনদা' একা রামেশ্বরজীকে খাওয়াতে পারবেন না।

মাখনদা'কে গম্ভীরভাবে বসে থাকতে দেখে, বজুর আর সাহস হল না তাঁকে কিছু বলতে। কালকে অনেকটা হাঁটার জন্তে স্মশীলবাবুর পাটা বেশ টাটিয়ে উঠেছে তাঁকে বাড়ীতে রেখে আমরা দু'জনে একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়লুম।

খাবারের দোকানের সামনে বেজার ভিড়। কালকের



## নেপালের পথে

শিব-রাত্রির উপবাসের পর গরীবদের মিঠাই পুরী খাইয়ে বাঙ্গালী মহিলারা পুণ্য সঞ্চয় করছেন। আমাদের কয়েকজন এসে ধরলে, তাদের মিঠাই খাইয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবার জন্ম। কিন্তু আমাদের হাব-ভাব দেখে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

মন্দিরের মধ্যে অনেকে পূজো দিতে চলেছেন। পূজারীর হাতে ভক্তরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নৈবেদ্য তুলে দিচ্ছেন। তিনি দেবতার পায়ে তা স্পর্শ করিয়ে তাদের ফিরত দিচ্ছেন। অনেক তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের জুলুম দেখেছি। ঘোল আনার পূজোর কমে মুক্তি মিলবে না; তার উপর আরো ঘোল আনা পাণ্ডা ঠাকুরের প্রণামী—তীর্থক্ষেত্রে হাট বাজারের মত যেন মুক্তি বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু এখানে ভক্তরা যে যা পারে তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছে। আর পূজারী ঠাকুর সর্বদাই প্রকুলভাবে যাত্রীদের নৈবেদ্য ভগবানের কাছে উৎসর্গ করে দিচ্ছেন।

ফিরবার পথে দ্বারভাঙ্গার চিত্তবাবু ও তাঁর মার সঙ্গে দেখা। সুশীলবাবুর শরীর অসুস্থ শুনে তিনি চলেন আমাদের সঙ্গে সুশীলবাবুকে দেখতে।

## নেপালের পথে

বাড়ী ফিরে দেখি মাখনদা'র ঘরে রামেশ্বরজীর ভোজন-পক্কটা খুব সমারোহে চলেছে। মাখনদা' গলায় কাপড় দিয়ে করজোড়ে বসে আছেন—ভগ্নী ও স্ত্রী জামাই আদরে রামেশ্বরজীর সেবা করিয়ে চলেছেন। রামেশ্বরকে নিয়ে এখন আমাদের অনেক জায়গায় যেতে হবে। অতএব তাড়াতাড়ি ভোজনটা সেরে নেবার জন্ত বন্ধু হুকুম দিয়ে বসল। চিত্তবাবুকে স্মৃশীলবাবুর কাছে রেখে রামেশ্বরের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বোধনাথের স্তূপ :—

গুহুদেবীর মন্দিরের সামনের ছোট পুলের উপর দিয়ে বাঘমতী নদী পার হয়ে খোলামাঠের উপর পড়া গেল। একটু এগিয়েই প্রকাণ্ড একটা গম্বুজ সামনে দেখতে পেলুম। এইটাই হচ্ছে বোধনাথের স্তূপ। রামেশ্বরের নিকট গুনা গেল, এক রাজা তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত স্তূপটী নির্মাণ করে বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপন করেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই সামনে বুদ্ধদেবের মন্দির। গুনা গেল যে মন্দিরের ভিতর একটা প্রদীপ প্রায় একশ বছর ধরে জ্বলে আসছে। বুদ্ধ মূর্তি ব্যতীত আরো দুই একটা মূর্তি মন্দিরে

## নেপালের পথে

আছে। এক সময়ে মন্দিরের পাশে অনেক জল জমা ছিল। এই গম্বুজ দিয়ে সেই জলকে আটকে রাখা হয়েছে। কয়েক বৎসর অন্তর এই গম্বুজের ভিতর থেকে জল বার করে দেওয়া হয়। সেই পবিত্র জল পান করবার জন্ত তিব্বত থেকে লোক এ পর্য্যন্ত আসে। মন্দিরের উপরের সিঁড়ি দিয়ে গম্বুজের উপর উঠনুম। দূরে কাট্-মণ্ডু ও পশুপতিনাথের সহরটা ছবির মত দেখা যেতে লাগল। গম্বুজের উপরটা সোনা দিয়ে মোড়া ও মাথায় একটি সোনার টোপর বসান।

মন্দিরটা তিব্বতীদের একটা পবিত্র তীর্থস্থান। প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য তাঁবার কোঁট টানান আছে। এই কোঁটের মধ্যে বৌদ্ধ জগতের অনেক ধর্ম্মলিপি আছে। তিব্বতীরা মন্দির পরিক্রম করতে করতে এই কোঁটগুলি ঘুরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—যার নাম করে এই কোঁট ঘুরিয়ে দেওয়া হয় তার নাকি সমস্ত পাপটা খণ্ডন হয়ে যায়।

সেখান থেকে বৌদ্ধতীর্থ স্বয়ম্ভুনাথ হয়ে বাঘমতীর তীরে ফেরা গেল।

বাঘমতী নদীর তীরে এলে কাশীর কথা মনে পড়ে যায়।

## নেপালের পথে

কাশীতে যেমন গঙ্গার ধারটী বাঁধান এবং স্নানের জন্ত অসংখ্য ষাট রয়েছে এখানেও ঠিক সেই রকম। ওপারে সাধুদের কুটীর দেখা যাচ্ছে, তার পাশে ধর্মশালা ও পশুপতি-নাথের মন্দির। আমাদের নিকট গঙ্গা ঘেরকম পবিত্র নেপালীদের কাছে বাঘমতীর জলও সেইরূপ পবিত্র। কেউ কেউ এই জল-খারাকে গঙ্গা বলে। বাঘমতীর জলে পশুপতিনাথের পূজা হয়ে থাকে। নদীর তীরের উপর বড় বড় চাতাল—সেখানে শব দাহ হয়। নদীর মোহনার দিকে রাজা এবং রাজ-পরিবারের স্নানের জন্ত ষাট রয়েছে।

পশুপতিনাথের বাজার :—

পশুপতিনাথের মন্দির আর একবার দর্শন করে বাজারে আসা গেল। মন্দিরের পাশে খাবারের দোকান ; দোকানটী বেশ পরিষ্কার। পুরী, জিলাপী, সন্দেশ, নানা-রকমের মিষ্টি ও তরকারী পাওয়া যায়। কাঁচা কমলালেবুর খোসা দিয়ে এরা একটা চাটনি করে ; খেতে বড় উপাদেয়। বন্ধুর Boilerএর কয়লার জন্ত এখান হতে কিছু খাবার কেনা হল। খাবারের দোকানের পাশে সারি সারি চাল,

## নেপালের পথে

ডাল ও নানা তরি-তরকারীর দোকান। দোকানে খুব ভাল সরু চাল পাওয়া যায়। প্রতি সের চার আনা। চাল ও তরিতরকারী কিনে বাড়ী এসে দেখি শ্রীলবাবু ষোভ জেলে রান্না আরম্ভ করে দিয়েছেন।

আজকে সকালের দিকটা বেশ কনুনে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু এখন রোদ উঠতে ঠাণ্ডা কমে গিয়ে একটু একটু গরম বোধ হচ্ছে। দুজনে বাঘমতীতে স্নান করতে যাব বলে সবে তেল মাখতে বসেছি, এমন সময়ে মাখনদা' এসে উপস্থিত।

একটা প্রাতঃপ্রণাম জানিয়ে মাখনদা' কালকের ঘটনার জন্তু দুঃখ করতে লাগলেন। বলেন—আমরা মটর ঠিক করে আপনাদের জন্তু অপেক্ষা করছি, কিন্তু চার-তলার জেঠাইমা বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে এত করে বল্লুম যে ছেলে দুটী আমাকে তাদের জন্তু অপেক্ষা করতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছে, কিন্তু রোদে সকলের কষ্ট হবে বলে জেঠাইমা মটর ছাড়তে বলেন।

বন্ধুটী তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—আপনাদের সঙ্গে আমাদের না যাওয়াতে একরকম ভালই হয়েছে। আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী জায়গা দেখে এসেছি।

## নেপালের পথে

তারপর আরম্ভ হল, আমরা কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলুম তার লিষ্ট। উপরের জেঠাইমা তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। হর-ধনু ভঙ্গের পুকুরের কথা শুনে তিনি রমেশকে ধরে বসলেন তাঁকে একবার সেখানে নিয়ে যেতেই হবে। রমেশ যত বলে সঙ্ক্যার অন্ধকারে আমরা সেখানে গিয়েছিলুম, এখন আমাদের পথ চিনে সেখানে যাওয়া অসম্ভব, তবুও তিনি ছাড়েন না। অবশেষে রামেশ্বরের ভাই বীরভদ্রকে জেঠাইমার হরধনু ভঙ্গের পুকুর দেখানর ভার দিয়ে আমরা স্নান করতে বেরিয়ে পড়লুম।

তিন দিন পরে আজ স্নান করে শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হল। তার উপর আহারটা হ'ল বেশ গুরুতর। সামনেই দেখি জেঠাইমা তাঁর ছোট দলটী নিয়ে মাখনদার জন্তু বসে আছেন। মাখনদাকে জলদি করতে বলে জেঠাইমার সঙ্গে গল্প করতে বসলুম। শুনলুম জেঠাইমা তাঁর পাড়ার ছুটি মেয়ের সঙ্গে এখানে এসেছেন—সঙ্গে কোন পুরুষ অভিভাবক নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম—এইযে আপনি এতদূরে একা এলেন ছেলেরা তাতে আগন্তি করল না ?

## নেপালের পথে

তিনি বলেন—ছ-বছর আগে যখন বদ্রিনারায়ণে যাই, ছেলেরা তখন মহা হৈ চৈ করে উঠল ; কিছুতেই আমাকে একা যেতে দেবে না। অনেক কষ্টে তাদের রাজী করে বদ্রিনারায়ণে গেলুম। ছেলেরা ভেবেছিল, মাকে আর ফিরতে হবে না। কিন্তু যখন জ্বল জ্বাল ফিরে এলুম ছেলেরা একেবারে অবাক। তারপর পুরী, ষারকায় গিয়েছি, ছেলেরা আর কোন আপত্তি করেনি। সপ্তের এই মেয়েদুটীকে বদ্রিনারায়ণ আমায় মিলিয়ে দেন— একটী আমায় মা বলে, আর অপরটীর আমি জেঠাইমা। আমার ভবঘুরে জীবনে এরাই আমার সাথী, .... পশুপতিনাথের নাম নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি, তখন কোন মুস্থিলে পড়তে হবে না—এ বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহলে এখানে আসাই বুঝা !

জেঠাইমা অনেকদিন তিনকুড়ী পার হয়েছেন। কিন্তু এই বয়সে আরও দুইটী মেয়ের ভার নিয়ে এই অজানা দেশে তীর্থ করতে আসতে দেখে বিস্মিত হলাম। মাখনদা এসে জানিয়ে দিলেন তিনি প্রস্তুত। আমরা কাট্-মণ্ডুটে বেড়াতে যাচ্ছি শুনে তিনি তাঁর দল নিয়ে আমাদের সঙ্গে

## নেপালের পথে

চল্লেন—ঠিক হল ফিরবার পথে তাঁরা হর-ধনুর পুকুর দেখে বাড়ী আসবেন। কাট্-মণ্ডু সহরে পৌঁছে মাখনদা গেলেন ‘British-legation’ দেখতে আর আমরা চল্লম সহরের দিকে।

বুটিশ লীগেশান :—

সে আজ অনেকদিনের বিশ্বৃত কাহিনী। তিব্বত থেকে একদল মঙ্গোলীয় জাতি হিমালয় পার হয়ে এসে নেপালে প্রথম বসবাস আরম্ভ করে। এদের নাম ছিল নেওয়ার। ধর্ম্মে তারা বৌদ্ধ। রাজ্য বিস্তারের দিকে মন না দিয়ে তারা তাদের সমস্ত শক্তিটা রাজ্য গঠনেরদিকে নিয়োজিত করল। পাহাড় হয়ে উঠল উর্বর, রাজ্যে এল সুখ শান্তি। চারিদিকে ললিতকলার বিকাশ সাধনের একটা সাড়া পড়ে গেল। তার ফলে নানা কারুকার্যময় প্যাগোডার আকার-বিশিষ্ট গগনস্পর্শী মন্দির ও প্রাসাদ নির্মিত হল। মন্দিরে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি স্থাপিত হয়ে মহা ধুমধামে পূজা চলতে থাকল। শুনা যায় এই সময়ে পশুপতিনাগের মন্দির নির্মিত হয়। সেইজন্তু আমরা আজও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব মন্দিরের উপর দেখতে পাই।



## নেপালের পথে

তারপর এল আর এক যুগ। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানের হাত থেকে ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার আশায় একদল রাজপুত সিতোর ত্যাগ করে পশ্চিম নেপালে এসে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে এই বৈদেশিক রাজপুত ও নেপালের অগ্ৰাণু জাতির সমবায়ে গুর্খা নামে একটা বীরজাতির অভ্যুদয় হয়। কিছুদিনের ভিতর আশে পাশে অনেক স্থান জয় করে গুর্খারা তাদের বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগল। অবশেষে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা সমস্ত নেপাল জয় করে ফেলে। ক্রমে ক্রমে তাদের রাজ্য পূর্বদিকে ভূটান ও পশ্চিমে শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপালের সীমানা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর সঙ্গে প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়। লর্ড হেষ্টিংস (Earl of Moira) নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে এই স্বাধীন রাজ্যটাকে মুছে ফেলবার জন্তে চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করা হল। কিন্তু তাদের গরিলা যুদ্ধের সামনে ইংরেজ পরাজিত হতে লাগল। প্রধান সেনাপতি জিলেস্‌পি এই যুদ্ধে মারা গেলেন। চারিদিকে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল।

## নেপালের পথে

এমন সময়ে খবর এল সেনাপতি অক্টরলোনি মেলন যুদ্ধে  
পুখা। সেনাপতি অমর সিংকে পরাজিত করেছেন।  
সিগৌলীতে তখন ইংরাজদের সঙ্গে একটা সাময়িক সন্ধি হল।

নেপাল-দরবার কিন্তু সে সন্ধি মানতে রাজী হলেন না।  
আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেনাপতি অক্টরলোনি তাঁর সৈন্য  
নিয়ে কাট্-মণ্ডু জয় করতে চলেন। অনেক যুদ্ধেব পর  
নেপাল গবর্নমেন্ট ‘সিগৌলীর’ সন্ধি-পত্র গ্রহণ করলেন।  
ষারওয়াল, কুমায়ূন ও সিকিম প্রদেশ ইংরাজরা পেলেন।  
একজন করে ব্রিটিশ রাজদূত নেপালের রাজ-ধানী কাট্-  
মণ্ডুতে থাকবেন বলে ঠিক হল। এই রাজ-দূতের জন্ম  
কাট্-মণ্ডুর বুকে সুদৃশ্য British legation তৈয়ারী  
হয়ে উঠেছে।

\* \* \* \* \*

নেপালের উত্তরে তুষার ধবল হিমালয় ও তিব্বত ; দক্ষিণে  
বিহার, যুক্ত প্রদেশের উত্তর অঞ্চল ও নেপাল-তরায়ের প্রসিদ্ধ  
জঙ্গল ; পূর্বে সিকিম ও দার্জিলিং ; পশ্চিমে নৈনিতাল ও  
আলমোড়া। লম্বায় পূর্ব-পশ্চিমে ৪৫০ মাইল ও চওড়ায়  
উত্তর-দক্ষিণে ১৫৫ মাইল। মোট পরিমাণ ৫৪০০০ বর্গ

## নেপালের পথে

মাইল। রাজ্যের লোক সংখ্যা ৫৬ লক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ মগার সম্প্রদায় থেকে প্রধানতঃ সেনাদল গঠিত হয়। নেপালের স্থায়ী সৈন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

চিরন্তন তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের কোলে ছোট্ট উপত্যকা। তার চারিদিকে চারটি সহর—ভাটগাঁও, পশুপতিনাথ, কাট্-মণ্ডু ও পাটান। নেওয়ারদের সময়ে ভাটগাঁও, পাটান ও কাট্-মণ্ডুতে তিনজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। গুর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ সকলকে পরাজিত করে কাট্-মণ্ডু সহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

কাট্-মণ্ডু সহর :—

কাট্-মণ্ডু বা কাট্-মট্ট সহরটী একেবারে বাংলাদেশের মত সমতল—কোথাও তার উচু নীচু নেই। বাহিরে থেকে দেখলে মনে হয় না যে পাঁচ হাজার ফুট উচু পাহাড়ের উপর এই সহর। সামনেই কুচ-কাওয়াজের বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের পশ্চিমে রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরাদি সহ পুরাতন সহর।

১৯৩৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে পুরাতন সহরটীর সমস্ত

নেপালের পথে



রাজ-প্রাসাদ ( কাট-মণ্ডু )



## নেপালের পথে

হ্রী নষ্ট হয়ে গিয়াছে। নানা কারুকার্যময় মন্দির ও অতুল্য স্তম্ভ সমূহ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষের একদিকে পূর্ববর্তী যুগের রাজাদের সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ এবং তারই নিকটে কুলদেবতা ‘তালেজুর’ মন্দির। এখানকার রাজপথ গুলি সংকীর্ণ এবং পথের দুপাশে অভ-ভেদী অট্টালিকা। প্রত্যেক অট্টালিকা প্যাগোডার আদর্শে নির্মিত। দরজা ও জানালাগুলি ভাটগাঁওর মত নানা কারু-কার্য খচিত ও জালতি বিশিষ্ট। এখানে একটী বিশাল দরবার কক্ষ আছে—নাম তার হুম্মান-দোখা।

ময়দানের অপরদিকে নূতন সহর। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। বাড়ীগুলি যুরোপীয় ধরণের। এখানে কোন প্যাগোড়া বা মন্দির নেই। আছে কেবল সেনাবারিক, বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল, রাজ-প্রাসাদ ও বড় বড় রাজ পুরুষদের বাড়ী। গত মহাযুদ্ধে যে সমস্ত নেপালী-সৈন্য হুদূর যুরোপের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মরণার্থে এখানে একটী হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। এই সহরটী গুখা-রাজার তৈয়ারী, সেইজন্য এখানকার

## নেপালের পথে

সবই নূতন। ইলেকট্রিক আলো, জলের কল ও বিদেশীদের থাকবার জন্য এখানে ত্রিপুরেশ্বরী Rest house আছে। ময়দানের এক কোণে একটী মনুমেন্ট আছে, নাম তার সোমধারা বা শোনধারা। বহুদূর থেকে এই মনুমেন্ট দেখতে পাওয়া যায়। বিগত নেপাল মহাবাঙ সামসের জং বাহাদুর ও দুই একজন বড় সৈন্যধ্যক্ষের প্রস্তর মূর্তি এখানে আছে।

ইলচক :—

সহরের পাশেই প্রকাণ্ড বাজার। নানা জিনিষ এখানে পাওয়া যায়—কিন্তু বেশীরভাগই জাপানী। কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কাপড়ের দোকান এখানে আছে। নেপাল দেশের তৈয়ারী নানা রং বেরং এর কাপড় ও জুতা এখানে বিক্রী হচ্ছে। নানা পিতলের দ্রব্য দোকানে সাজান রয়েছে। নেপাল যে এক সময় পিত্তল-শিল্পে বিখ্যাত ছিল তা এগুলি দেখলে সহজে অনুমান হয়। কয়েকজন নেপালী চামর ও কব্বল বিক্রী করছে। পকেট খালি হবার ভয়ে বন্ধুটী তাড়াতাড়ি পাটানের দিকে চলল।

## নেপালের পথে

ললিত পাটান :—

কাট্-মণ্ডু সহর থেকে মাইল খানেক দূরে পাটান।  
সহরের রাজ-পথগুলি সজ্জীর্ণ। দরবার-কোয়ার দেখতে  
অতি সুন্দর। এর একদিকে সারি সারি প্যাগোডার  
আকার বিশিষ্ট মন্দির।

এখানে অত্যাশ্চর্য মন্দিরের মধ্যে ‘মচেস্ত্রনাথ’ প্রসিদ্ধ  
মচেস্ত্রনাথ হচ্ছেন নেপাল রাজ্যের রক্ষক। জাতীয়  
সকটের সময়ে তিনি নেপাল-রাজ্যের সম্মুখে আবির্ভূত হন  
এবং কি উপায়ে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা  
বলে দেন। প্রতি জুন মাসে মচেস্ত্রনাথের দেবমূর্তি রথে  
করে বার করা হয়। এই রথ প্রায় ২৫ ফুট উচু। মচেস্ত্রনাথ  
রথে উঠলে রুষ্টি অবশ্যস্তাবী। মচেস্ত্রনাথকে হিন্দু ও বৌদ্ধ  
সমান ভাবে পূজা করে থাকেন।

এখান থেকে কিছু দূরে চন্দ্ৰ-নারায়ণের বৈষ্ণব মন্দির ও  
কীর্তিপুর সহর। কিন্তু ফিরতে দেৱী হবে বলে আমরা  
কাট্-মণ্ডু সহরে ফিরে চললাম।

কুচকাওয়াজের মাঠের পাশে রাণী-পুকুর। মাখনদা’  
 তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। রমেশকে



## নেপালের পথে

দেখে খুব আগ্রহের সঙ্গে বলেন—‘বীরভদ্র এই রাণী-পুকুর ছাড়া আর কোন পুকুরের কথা বলতে পারলে না। এইটাই কি সেই পুকুর?’ ইসারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলে, বমেশ ভাড়াভাড়া পুকুরের দিকে এগিয়ে চলল। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে মাখনদা’ একটা আশ্চর্য। কিছু দেখবার আশায় তার পিছন পিছন চলেন। বন্ধু জলের ধারে গিয়ে বলে—আগে এখানে কোন পুকুর ছিল না। হরধনুর খানিকটা এখানে পড়ায় এই পুকুরের সৃষ্টি। পুকুরের আধ্যাত্মিক ইতিহাস শুনে মাখনদা’ খুব খুসী হয়ে উঠলেন।

বাড়ীর কাছে এসে দেখি আমাদের হাইকোর্টের বন্ধু অমিয় মুখার্জি একটা দোকানে বসে; পাশে এক বাঙ্গালী সাধুজী। এতদিন তাকে না দেখতে পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলুম পথে তার ছুটি কারবকল হয়। বীরগঞ্জ হাঁসপাতালে সে ছুটীকে ‘অপারেশন’ করে, দিন কতক নেপাল-মহারাজের অতিথি থেকে। ডাঙিভে করে আমার পথে সাধুটীর সঙ্গে আলাপ হয়। সেই থেকে এই রুগ্ন মানুষটীর উপর তিনি তাঁর স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে

## নেপালের পথে

আসছেন। অমিয় ও সাধুজীকে সাদরে আমাদের কুটীরে নিয়ে এলুম। মাখনদা'র কথা, জেঠাইমার হর-ধনুর পুঙ্ক দেখা প্রভৃতির গল্প করে সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া গেল।

রবিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী:—

এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছেন। বাড়ী প্রায় খালি হয়ে এসেছে। ক'দিনের আলাপে একটা প্রীতির বন্ধন সকলের মধ্যে জেগে উঠেছিল, তা' হিন্ন করে যেতে সকলেরই মন অল্প বিস্তর বিখিন্ন হয়ে উঠেছে। স্মৃতির খাতায় তিনদিনের হাসি কান্না জমা করে নিয়ে আমাদেরও বেরিয়ে পড়াতে হবে—হয়তো মাখনদা', জেঠাইমার দেখা এ জীবনে আর পাব না, তবুও এই পথের পরিচয়ের লাভটুকুও ত' কম নয়? ভিখারী মানুষ, সঞ্চয় তার পেশা। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছু ছ' হাত দিয়ে নিজের মাঝে টেনে নিয়ে নুতন কিছু সৃষ্টি করবার কল্পনাই ত' মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে!

বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যাত্রার আয়োজন শুরু

## নেপালের পথে

হয়ে গেল। আর একবার দেবদর্শন করে, দেবতার আশীস নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

দশটায় আমরা থান-কোটে পৌঁছলাম। স্থানীয় বাবুর জ্ঞান একটা ডাঙি ঠিক করতে হবে, কিন্তু চেয়ার-ওয়াল ডাঙি পাওয়া গেল না। শেষকালে সাড়ে এগার টাকায় ভাড়ায় একটা দড়ীর খাটুলি ঠিক করা হল। রেজিষ্টারী অফিসে বেজায় ভিড়। অতি কষ্টে কুলি ও খাটুলি বাহকেব রেজিষ্টারী-পর্ক শেষ করে বেলা সাড়ে এগারটায় আমরা চম্পাগড়ী পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। অল্প উঠে দেখি বাঙ্গালী-বুদ্ধারা কুলির ঝোলায় বা দড়ির খাটুলিতে করে চলেছেন। অনেকের আবার পুঁজি পশুপতিনাথে কমে যাওয়ায় শেষ সম্বল লাঠির উপর ভর দিয়ে আন্তে আন্তে পাহাড়ে উঠছেন।

বেলা একটায় আমরা চম্পাগড়ীর চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। নেপালী কমলা-লেবুওয়ালার নিকট হতে কমলালেবু কিনে নামতে শুরু করা গেল। এই পাহাড়ে উঠবার সময়ে কিনা কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এখন গড় গড়িয়ে নেমে চলেছি—কোন কষ্ট মনে হচ্ছে না। নেপালী গাহকরা স্তমধুরস্বরে

## নেপালের পথে

রামায়ণ গান করে যাত্রীদের সমস্ত কষ্ট দূর করে দিচ্ছে।  
বেলা আড়াইটের সময়ে আমরা চন্দ্রাগড়ী-ধর্মশালার সামনে  
এসে উপস্থিত হলাম।

একটু বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু হল। আকাশে  
কাল মেঘ দেখে পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দেওয়া গেল।  
পথের হুঁধারের দৃশ্য অতি মনোরম। মনে পড়ে যায়  
কোন এক অতীতের মহাবিপ্লবের কথা, যার ফলে প্রকৃতির  
বুকে এই অপক্লপ সৃষ্টি বৈচিত্রের উদ্ভব হয়েছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় আমরা কুলেখালিতে এসে পৌঁছলাম।  
ঝরণার ধারে অত বড় ধর্মশালাটা যাত্রীতে একেবারে ভরে  
উঠেছে। দোকানের অবস্থাও সেইরূপ। অনেক কষ্টে  
একটা দোকানের আধখানা দেড়টাক। ভাড়ায় ঠিক হল।  
রাণাঘাটের এক ভদ্রলোক পশুপতিনাথে কুলি  
রেজিষ্টারী করে, তাকে জিনিষের ভার দিয়ে বরাবর  
চন্দ্রাগড়ীর ধর্মশালায় এসে উঠেন। কিন্তু রাত হয়ে গেল  
তবুও কুলির দেখা নেই। দোকানদাররা আশ্বাস দিল  
কুলি খুব সম্ভব তাঁর জন্তে কুলেখালিতে অপেক্ষা করছে।  
সকালে উঠেই তিনি কুলেখালিতে এসেছেন, কিন্তু কুলির

## নেপালের পথে

সন্ধান মেলেনি। আবার ফিরে তিনি খোঁজ করতে যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বয়ুম, থানকোট হচ্ছে কুলিদের প্রথম Checking Station। সেখানে কুলির রসিদ না দেখান হওয়াতে এই গোলমাল হয়েছে। সামনেই শিশাগড়ী; সেইখানে কুলিদের প্রধান অফিস আছে। ওখানে গেলে নিশ্চয়ই কুলির খবর পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমাদের কুলির খোঁজে—কি জানি যদি আবার আমাদের অদৃষ্টে ঐরকম কিছু বিভ্রাট লেখা থাকে। একটু পরে কুলিকে আসতে দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল।

ষ্টোভ জ্বালতে বসলুম; কিন্তু দেখি Heaterটা পশুপত্তি-নাথে ফেলে এসেছি। ঘরে একটা উত্তুন পাতা আছে কিন্তু তার ফাঁকটা এত বড় যে আমাদের ছোট হাঁড়ী বসবে না। রাত্রে রান্নার উপায় হবে না শুনে রমেশ বসে পড়ল। গভীরভাবে জানিয়ে দিল যে আজকে রাত্রে পুরীর ব্যবস্থা হলে কালকে তারপক্ষে শিশাগড়ীর চড়াই উঠা সম্ভব হবে না। বন্ধু বেরিয়ে পড়ল খাবারের চেষ্টায়। খানিক বাদে একটা ঝকঝকে পিতলের হাঁড়ী নিয়ে হাজির; শুনলুম সবই

## নেপালের পথে

নাকি ভাড়া পাওয়া যায়। হাঁড়ী ত' পাওয়া গেল, কিন্তু কাঠ ভিজ়ে, উঠুন কিছুতেই ধরে না। রমেশ আবার শুকনো কাঠ আনতে ছুটলো।

ক্লান্তিতে চোখ হুঁটো ঢুলে আসছে। কিন্তু পেটের জ্বালা য়ুমকে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না। রাত গভীর হয়ে উঠছে, তবুও দলে দলে যাত্রী এখনও থানকোট থেকে আসছে। একে ছরস্ত শীত, তার উপর সমস্ত দোকান ভর্তি। এই সব যাত্রীরা যে কোথায় যাবে তার কোন ঠিক নেই। পথে আছে গাছতলা—ধর্মের নামে পাগল এই যাত্রীদল হয়তো সমস্ত রাতটা গাছতলায় কাটাবে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা, বিজ্ঞানের চাপে ধর্মকে পিষে ফেলতে চলেছি। কলেজের হুঁপাতা শিক্ষাতেই আমরা বুঝে নিয়েছি—ধর্ম একটা কুসংস্কার। ফ্রয়েড থেকে হলিউড পর্যন্ত আমাদের মুখে মুখে ঘোরে। ইউনিভার্সিটির চাপে পড়ে Old Testament, New Testament ও বাধ্য হয়ে হুঁপাতা পড়তে হয়েছে, কিন্তু বেদ উপনিষদ ত' দূরের কথা, রামায়ণ মহাভারতের নাম এক ইতিহাসের পাতা ছাড়া বড় একটা কোথাও চোখে পড়ে

## নেপালের পথে

না। অতএব ধর্মের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা ভালবাসা সে দিক থেকে দেখলে এর কি কোন প্রতিকার করা আমাদের উচিত নয় ?

পাহাড়ের রাস্তায় বিপদ পদে পদে। আশ্রয় ত' দূরের কথা, দরকার হলে, পাহাড়ের ত্রি-সীমানায় একজন হাতুড়ে ডাক্তারকেও পাওয়া যাবে না। অথচ কাট্-মণ্ডু সহরে বাঙ্গালী ডাক্তার ভর্তি বড় বড় হাঁসপাতাল আছে !

প্রতি বৎসর হাজার হাজার যাত্রী এই সময়ে পশুপতি-নাথ দর্শন করতে যায়। তাদের অর্থে নেপালের রাজ-ভাণ্ডার বেশ কিছু পূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ তাদের হুঃখ কষ্টের দিকে নজর দেবার দরকার কেউই মনে করে না।

মনে পড়লো কাট্-মণ্ডু সহরের British-legation এর আকাশ ফাটান বাড়ীটার কথা। কিন্তু একটা পরা-ধীন জাতের সুখ দুঃখের কথা ভাববার অবসর বোধ হয় তাঁদের হয়ই না !

সোমবার—২৪শে ফেব্রুয়ারী :—

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে স্নানীলবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পাহাড় পাড়ি দেবার জন্তে। কিন্তু কুলির এখনও দেখা নেই। রাতের ব্যুটিটা এখন থেমেছে কিন্তু পথ আরও পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। সামনেই শিশাগড়ীর ভীষণ চড়াই। যাত্রীরা এর মধ্যেই তাদের ছোট ছোট পোঁটলা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কুলিকে অনেক কষ্টে সন্ধান করে সকাল সাড়ে ছটায় যাত্রা করা গেল।

একদিন রায়ে বার অস্পষ্ট রূপ দেখে প্রাণে আতঙ্ক জেগে উঠেছিল, আজ দিনের আলোয় তার স্বরূপ দেখতে দেখতে চলেছি। পাতাল-পুরী থেকে একটা পায়ে চলা পথ ঘেন আকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে—একদিকে তার খাড়া পাহাড় অপরদিকে বিশাল খাদ।

লাঠির উপর ভর দিয়া যাত্রীরা সেই সরুপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। মুখে তাদের একই কথা—কি কষ্টে তাদের রাতটা কাল কেটেছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে



## নেপালের পথে

এব আগে কেদার ও বজ্রিনারায়ণে গিয়েছেন, কিন্তু তার পথ নাকি এত কষ্টকর নয়। সেখানে পথের দুধারে আছে চট্টা আর আছে কালী-কমলিওয়ালার দয়া।

কেদার তীর্থে সেরে কেন তাঁরা এই দুর্গম দেশে আসতে বাধ্য হয়েছেন তার একটা সুন্দর গল্প বলেন।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর একদিন স্বয়ং পশুপতিনাথের উপর পাণ্ডবশিবির রক্ষার ভার দিয়ে পঞ্চ-ভাই পাণ্ডব গেলেন কোথায় কি কাজে। ইতিমধ্যে অশ্বখমা এসে স্তব করে শিবকে প্রসন্ন করলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব চলে গেলেন কৈলাসে। অশ্বখমা দ্রোণদীর পঞ্চ-পুত্রকে পঞ্চ-পাণ্ডব ভেবে বধ করলেন।

পাণ্ডবেরা ফিরে এসে এই করুণ দৃশ্য দেখলেন। ভীম ছুটলেন কৈলাসে শিবের কাছে। তাঁর ভয়ে মহাদেব মহিষের রূপধরে একদল মহিষের ভিতর ঢুকে গেলেন। ভীম মহা কাঁপরে পড়লেন। দলের ভিতর থেকে মহাদেবকে পৃথক করবার জন্য ভীম এক ভীষণ মূর্তি ধরলেন। কেদার-নাথে এক পাও নেপালে আর এক পা দিয়ে তিনি মহিষদের সামনে দাঁড়ালেন। একটী ছাড়া আর সব মহিষই

## নেপালের পথে

তাঁর পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল। শিব হচ্ছেন ভীমের গুরু। সুতরাং তিনি ভীমের পায়ের তলা দিয়ে যেতে পারলেন না। ভীম বুঝতে পারলেন, কোনটী মহাদেব। তিনি মহিষটীর পিছনে ছুটলেন। কেদারে গিয়ে দেখলেন মহিষটীর পিছনটা পড়ে রয়েছে, মুখটা রয়েছে নেপালে।

সেই থেকে একটা প্রবাদ চলে আসছে যে, যারা কেদার দেখে নেপালে না যাবেন তাঁরা হবেন পশু। সেইজন্ম যাত্রীরা নেপালে এসেছেন তাঁদের পশুত্ব খণ্ডন করতে।

বেলা ন'টার আমরা শিশাগড়ীর ধর্মশালায় এলুম। রাণাঘাটের ভদ্রলোকের কুলির সন্ধান করা হল। গুনলুম চার জন কুলি এগিয়ে ভীমফেরীতে গিয়েছে। সেখানে যদি না কুলিকে দেখতে পাই, তাহলে এখানে এসে খবর দিলে, প্রভুরা দয়া করে তাদের অহুসন্ধান করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এঁদের কাছে ভীমফেরী ও শিশাগড়ী যেন এ বাড়ী ওবাড়ী—কিন্তু আমাদের কাছে যে একদিনের পথ!

একটু বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু হল। এখানকার একদল লোক ঘেরকষ খুব দরিদ্র, আর একদল আবার

## নেপালের পথে

সেই রকম ধনী। কুলিদের মত এত দরিদ্র আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার মধ্যে তাদের একটি ছেঁড়া পায়জামা ও একটি কোর্তা। সরাব টেনে হাড় ভাঙ্গা শীতের হাত থেকে তাদের নিস্তার পেতে হয়। তাদের খাওয়াটাও আবার বিচিত্র। মহিষের মাংস ও মোটা মোটা কুটি খেয়ে তারা দিন কাটায়।

বেলা এগারটায় আমরা ভীমফেরীতে পৌঁছলাম। রাণাঘাটের ভদ্রলোক তাঁর কুলির দেখা পেলেন। তাঁকে আবার হেঁটে শিশাগড়ীতে ফিরতে হবে না ভেবে আনন্দিত হলুম। বন্ধুটী এক দোকানে একটা কাঁচের গেলাস ভেঙ্গে এখানকার সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিল।

লরীতে করে বেলা ছ'টায় আমরা আমলেখগঞ্জে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পাওয়া গেল। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আমরা রক্সোলে পৌঁছলুম।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে স্টেশান যাত্রীতে ভরে গেল। যাত্রীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। অনেকেই বাংলা দেশের বিভিন্ন পল্লী থেকে একা এসেছেন। আসবার সময় যাহোক করে এসেছেন কিন্তু কী করে যে ফিরবেন তারই

## নেপালের পথে

সমস্তায় পড়েছেন। এখান থেকে ফিরবার হুঁচী পথ—একটা সাঙুলী হয়ে, আর অপরটা ষারভান্ধার মধ্যে দিয়ে। কে কোন দিক দিয়ে যে ফিরবে তাই নিয়ে খুব গোলমাল চলছে। ষ্টেশানমাষ্টার তাঁর সাধ্যমত সকলকে সাহায্য করতে লাগলেন।

রাত আটটায় ট্রেন ছাড়লো। বুঝার ঠাঁদের নাতি নাতনীদের অন্ত কেনা উপহারের পোঁটলা সামলাতে ব্যস্ত। বাড়ী ফেরার আনন্দে সকলেই ভরপুর।

বারটায় আমরা বইরাগনিয়ায় পৌঁছলাম। সেখান থেকে ট্রেন বদল করে ষারভান্ধার ট্রেনে উঠে পড়লুম। পথে পড়ল সীতামারী ও জনকপুর রোড ষ্টেশান। জনকপুর রোড ষ্টেশান থেকে বাস পাওয়া যায়। সেই বাসে ২৪ মাইল গেলেই রামসীতার মন্দির। সেইখানে প্রসিদ্ধ হর-ধনু ভঙ্গ হয়—যাকে নিয়ে রমেশ নেপালে এত কাণ্ড করে বসল।

জনকপুর ছাড়ালে কাম্‌টোল ষ্টেশান পড়ে। এই ষ্টেশানের নিকটে অহল্যাদেবীর মন্দির। এখানে অহল্যা পাবান হয়ে ছিলেন।

মঙ্গলবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী :—

আকাশ ধূসর হয়ে আসছে। দূরে দ্বারভান্ডার স্টেশান দেখা যাচ্ছে। সুশীলবাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে তাঁর বৈরাগ্যের ভাবটা একেবারে চলে গেছে। আমাদের পথও শেষ হয়ে এলো।

\* \* \* সমস্ত দিনটা গেল কয়দিনের সুখ দুঃখের ইতিহাস নিয়ে। বৈকালে একবার দ্বারভান্ডার রাজপ্রাসাদ দেখে আসা গেল।

বুধবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী :—

বেলা ত্রুটো। ষ্মারভাঙ্গার ঠেশানে স্মশীলবাবুর নিকট হতে বিদায় নিলুম। তিন জনের একজনকে রেখে আবার আমবা ছু'জনে ফিরে চলেছি। যাবার সময় কত উল্লাস কত উৎসাহ, কিন্তু ফিরতি পথে মনে সে উল্লাস নেই। দেখার চেয়ে না দেখার আনন্দ বোধ হয় বেশী। কল্কাতায় নেপালের যে রূপ মনে এঁকেছিলুম, বাস্তবের রুঢ় আঘাতে তা' চূর্ণ হয়ে গেছে। মনে হয় যা দেখেছি তার থেকেও সুন্দর হওয়া বৃষ্টি উচিত ছিল। বারুণীতে বন্ধু অমিয় ও সাধুজীর সঙ্গে দেখা হলো। সাধুজী যাবেন কিউলে, বন্ধু কলিকাতায়; আমরা যাব দেওঘরে।

\* \* \* রাত তখন বারটা। কৰ্ম্মরাস্ত পৃথিবী গভীর স্তম্ভিতে মগ্ন। গাড়ী এসে থামলো যশিডির ঠেশানে। মাসু ও চক্ৰ প্লাটফরমে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন। \* \* দূরে ডিস্টেন্ট্ সিগনালের লাল আলোটা জ্বল জ্বল কচ্ছে। \* \* \*